স্বামী অভেদানন্দ

আত্মজ্ঞান

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৪১

[মূল্য ৸৹ আনা

প্রকাশক

স্বামী সদ্‌রূপানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

১৯ বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট

মুদ্রাকর

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী

পুরাণ প্রেস

২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

যাঁহার কৃপা কটাক্ষে
আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছি
সদ্‌গুরু সেই যুগাবতার ভগবান্‌
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শ্রীচরণকমলে
ভক্তি সহকারে সমর্পিত হইল।

ভূমিকা

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জড়বাদ ও আত্মার অস্তিত্বে অনাস্থা জনসাধারণের মনোরাজ্যে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, শিক্ষিত সমাজের অতি অল্পসংখ্যক লোকই অমর আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুদিগের সনাতন ধর্ম্মে ও বেদান্ত দর্শন শাস্ত্রে আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্ সমূহে আত্মজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, উহা দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মূল ভিত্তি স্বরূপ। তজ্জন্য আত্মজ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবার প্রথম সোপানস্বরূপ আত্মানাত্ম-বিবেক এবং জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য অনুভব করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ আমেরিকা মহাপ্রদেশের নিউ-ইয়র্ক নগরীতে বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মজ্ঞান বিষয়ে প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা পুস্তকাকারে 'Self-knowledge' নামে উক্ত সমিতি হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি আমেরিকা মহাপ্রদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

স্বামীজী মহারাজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ঔপনিষদিক সত্যগুলি কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ

তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য উক্ত Self-knowledge পুস্তকের বঙ্গানুবাদ স্বামীজী মহারাজের নিজ তত্ত্বাবধানে এক্ষণে প্রকাশিত হইল। আশা করি পাঠকবর্গ এই অমূল্যবত্নস্বরূপ 'আত্মজ্ঞান' লাভ করিয়া নিজ অমর আত্মার পরিচয় পাইবেন এবং দেহাত্মবোধ হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। অলমিতিবিস্তারেণ।

২২শে ফাল্গুন সন ১৩৪১
ইং ৬ই মার্চ্চ ১৯৩৫
বুধবার, শুক্লাদ্বিতীয়া

প্রকাশক

সূচীপত্র

"এতা দশৈব ভূত মাত্রা অধিপ্রজ্ঞং
দশ প্রজ্ঞা মাত্রা অধিভূতং।
যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যু র্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যু,
র্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যু র্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ ॥
ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ।"—
কৌষীতকী উপনিষৎ। ৩। ৮

অন্বয়ার্থঃ—জ্ঞেয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সহিত বিষয়ীর (জ্ঞাতার বা আত্মার) সংশ্রব আছে এবং বিষয়ীরও (জ্ঞাতার বা আত্মারও) জ্ঞেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সংশ্রব আছে। জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে জ্ঞাতা বিষয়ী থাকিত না এবং জ্ঞাতা বিষয়ী (আত্মা) না থাকিলে জ্ঞেয় বিষয় থাকিত না। এই দুইটির মধ্যে একটি না থাকিলে কেবল অপরটির দ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না।

আত্মা ও জড়

(Spirit and Matter)

আত্মা ও জড় সম্বন্ধে বিচার সভ্য জগতের সকল বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ্য আলোচনার বিষয়। বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ উক্ত দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ দুইটি নামের বিবিধ সংজ্ঞা প্রচলিত আছে, যথা :—জীবাত্মা ও জড় (ego and non-ego), জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (subject and object), পুরুষ ও প্রকৃতি (soul or mind and matter), চেতন ও অনাত্মা ইত্যাদি। যুগে যুগে যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই সম্বন্ধে তাঁহাদের ভাব ও ধারণার অনুকূলে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা, মন বা পুরুষ হইতেই অনাত্মা, জড়, অচেতন পদার্থ সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, অনাত্ম জড় পদার্থ হইতে আত্মা, মন বা পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে। এইপ্রকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। ঐ মতগুলি সংখ্যায় অধিক হইলেও সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—অধ্যাত্মবাদ বা

বিজ্ঞানবাদ, জড়বাদ এবং অদ্বৈতবাদ। অধ্যাত্মবাদী বা বিজ্ঞান-বাদিগণ বলেন যে, আত্মা বা মন জড়জগতের ও অচেতন শক্তির সৃষ্টিকর্ত্তা। * সুতরাং আত্মাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব্বপ্রকার পদার্থেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। অতএব ইহাদের মতে অনাত্মা বা জড়জগৎ আত্মা বা চৈতন্যের একটি অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে, জড়বাদিগণ বলেন যে, অচেতন, অনাত্মা বা জড় হইতেই চৈতন্যের বা আত্মার উদ্ভব হইয়াছে।

বিভিন্ন দেশে সময় সময় বহু অধ্যাত্মবাদী বা বিজ্ঞান-বাদী দার্শনিক পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষে গ্রীসে, জার্ম্মানীতে এবং ইংলণ্ডে বিশপ বার্কলের † ন্যায় বহু বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রতীয়মান বাহ্য জগতের এবং জড়ের সত্ত্বা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে এই জড়জগৎ সমস্তই মনের ভাব মাত্র। মার্কিন দেশের আধুনিক খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে, জগতে জড় পদার্থ বলিয়া কোনও বস্তু নাই; সমস্তই মনের কার্য্য। ইহারা বিশপ বার্কলে এবং সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক পণ্ডিতের ধারণার অনুবর্ত্তী হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমেরিকা মহাদেশে এই বিজ্ঞানবাদীর

---

* "মনো হি জগতাং কর্ত্তৃ মনো হি পুরুষঃ স্মৃতঃ॥" যোগবাশিষ্ট।

† বিশপ বার্কলে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক ছিলেন।

ভাব সম্পূর্ণ নূতন; কারণ আমেরিকাবাসিগণ জগতের অপর জাতি অপেক্ষা আধুনিক। আমেরিকাতে এ পর্য্যন্ত কোনও প্রতিভাশালী বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় নাই।

পক্ষান্তরে, অধুনা অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক, শরীরতত্ত্ববিৎ, জড়বিজ্ঞানবিৎ (Physicist), রসায়নশাস্ত্রবিৎ, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং ক্রমবিকাশবাদী এই বিশ্ব সম্বন্ধে জড়বাদের সমর্থন করিয়া থাকেন। সমস্ত পদার্থের উপাদান কারণ 'জড়-পদার্থ'—ইহা তাঁহারা দেখাইতে প্রয়াস পান। তাঁহারা আরও বলেন যে, জড়-পদার্থ হইতে মন ও আত্মার উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও জগতে কোটি কোটি লোক এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেন এবং জড়বাদী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের ভিতর বোধ হয় অতি অল্পসংখ্যক লোকেই জড় অথবা অনাত্মার স্বরূপ কি, কিম্বা অনাত্মা বা জড় বলিতে কি বুঝায়, তাহা পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন। অনাত্মা বা জড় এই পদার্থটির স্বরূপ কেহ কি কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? জড়বাদিগণকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, আমরা কি জড় পদার্থ দেখিতে পাই? উত্তরে 'না' বলিতে হইবে,। কারণ চক্ষু দ্বারা আমরা সাধারণতঃ যাহা দেখি তাহা 'বর্ণ' ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই বর্ণ এবং জড় কি একই পদার্থ? কখনই না। বর্ণ একটি গুণ বিশেষ; উহা কোথায় থাকে? সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের বিশ্বাস এই যে, পুষ্পের বর্ণ আমরা যাহা

প্রত্যক্ষ করি, তাহা সেই পুষ্পের মধ্যেই নিহিত আছে। কিন্তু শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, ঐ বর্ণ যাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহার বাস্তবিক কোনও পৃথক অস্তিত্ব নাই। উহা একপ্রকার অনুভূতিমাত্র (sensation)। আলোক-রশ্মির কম্পন-বিশেষ পুষ্পে প্রতিফলিত হইয়া অক্ষিপট (retina) ও দর্শন-নাড়ীর (optic nerves) সাহায্যে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে এবম্বিধ অনুভূতি উৎপন্ন করে। এই প্রকার ব্যাখ্যা সাধারণ লোক অদ্ভুত বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। 'ইথার' নামক পদার্থের ('আকাশ' তন্মাত্রার) আণবিক-কম্পন চক্ষুর মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইয়া মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে অন্য এক প্রকার কম্পনের সৃষ্টি করে। উহা আমাদের চৈতন্যময় পুরুষের (Conscious ego) সাহায্যে বর্ণ-বিশেষের অনুভূতি করায়; সুতরাং বাহ্য-প্রকৃতি (জ্ঞেয়) ও অন্তঃপ্রকৃতির (জ্ঞাতার) উপাদান সমূহের সংমিশ্রণের ফলেই বর্ণ-বিশেষের জ্ঞান জন্মে; অর্থাৎ বাহ্য-জগৎ হইতে সম্প্রাপ্ত জ্ঞেয় বস্তুর কম্পনের সহিত মানসিক অনুভূতির সম্মিলনেই বর্ণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, পুষ্পের বর্ণ পুষ্পের মধ্যে নিহিত নহে; পরন্তু উহার উপলব্ধি অক্ষিপটের, চক্ষুর অন্তর্গত দর্শন-নাড়ীর এবং মস্তিষ্কান্তর্গত ক্ষুদ্র কোষ সমূহের (brain cells) উপর নির্ভর করে। সুতরাং চক্ষুগ্রাহ্য বর্ণটি ইংরাজী শব্দ matter (জড়) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হইতে পারে না।

এইরূপে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে শব্দটি আমরা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহাই কি জড়? না, তাহা নহে। ইহাও আকাশ-স্থিত বায়ুর কম্পন ও চেতনা-সংযুক্ত মানসিক ক্রিয়ার সম্মিলনের ফলস্বরূপ। গভীর নিদ্রাবস্থাতে শব্দরূপ বায়ুর কম্পন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কস্থ ক্ষুদ্র কোষ সমূহে পৌঁছায়। কিন্তু আমরা তখন কিছুই শুনিতে পাই না। কারণ, উপলব্ধি-করণক্ষম মন তখন শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে অসংযুক্ত থাকায় শব্দের অনুভূতি উদ্রেক করিতে পারে নাই। সুতরাং শব্দকেও আমরা জড় পদার্থ বলিতে পারি না।* তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে জড় বা অনাত্ম বস্তুটি কি?

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে রূপ, শব্দ প্রভৃতি উপলব্ধির—নিত্যসম্ভাবনা (permanent possibility of sensation) ইহাই 'জড়' সংজ্ঞার প্রকৃত অর্থ। এবং অনুভূতির নিত্য-সম্ভাব্যতার (permanent possibility of feeling) নাম 'মন' বা চৈতন্যময় আত্মা (mind)। মিল সাহেবের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের জড় সম্বন্ধে ধারণা কি নির্ভুল ও জটিলতা-শূন্য হইল? না, পক্ষান্তরে ইহা আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল। উপরি উক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে 'সম্ভাবনা'

* এই প্রকারে দেখাইতে পারা যায় যে, জড় পদার্থ আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কখনও হইতে পারে না।

(possibility) এই শব্দটি মনে সংশয় উৎপাদন করে। ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় যে, যাহা নিত্য অর্থাৎ সর্ব্ব সময়ে এবং সকল অবস্থাতে জ্ঞেয় থাকে এবং যাহার অনুভব সম্ভবপর হয় তাহাই জড় পদার্থ। পক্ষান্তরে, যাহাতে নিত্য অর্থাৎ সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে অনুভূতি সম্ভবপর হয় তাহাই চৈতন্যময় আত্মা বা মন। অথবা অর্থটি আরও পরিস্ফুট ভাবে বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে, যাহা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়, তাহাই জড় পদার্থ। অথবা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় মাত্রই জড়; এবং যিনি অনুভব কর্ত্তা, বিষয়ী তিনিই আত্মা বা চৈতন্যময় পুরুষ (Spirit)।

যাহা নিরন্তরভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি উৎপাদন-করণক্ষম, তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে স্থূল বহিরিন্দ্রিয়সমূহ একেবারেই অসমর্থ। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র বিষয়ানুভূতির উন্মুক্ত প্রবেশদ্বার স্বরূপ। আমরা জড় সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, উহা অনুভূতি উৎপন্ন করে, অর্থাৎ জড়পদার্থ জ্ঞানের উত্তেজক কারণ। যখন আমরা জড়ের স্বরূপ লক্ষণ জানিতে চেষ্টা করি, অথবা তৎসংক্রান্ত বিশেষ তথ্য নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক হই, তখন আমরা ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা এই বিষয়ে কোনও সাহায্য পাই না। চক্ষুদ্বয় দ্বারা কেবল রূপ দেখিতে পারা যায়; কর্ণদ্বয় দ্বারা কেবল শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; নাসিকাদ্বয় দ্বারা গন্ধ অনুভব করা যায়। এইরূপে আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বাদ,

স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ উপলব্ধি করিবার জন্য যন্ত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ উহারা জড়ের জ্ঞাপক মাত্র; জড়ের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ। বাহ্য জগতের সমস্ত পদার্থের অনুভূতি আমাদের এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা অনুযায়ী সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য, সর্ব্বপ্রকার বিষয়জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির পরিচালনার মুখ্য বা গৌণ ফল স্বরূপ। যদিও আমরা জানি যে, জড় নামক পদার্থটি দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং উহা নানাপ্রকার বিষয়ানুভূতির কারণ স্বরূপ, তথাপি ইহাকে আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না, বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না। এই জড় পদার্থকে যে কোনও নামে অভিহিত করা যাউক না কেন, উহা সকল সময়ে অতীন্দ্রিয় থাকিবে। আমরা একটি কেদারা অথবা একখণ্ড কাষ্ঠ বা স্বর্ণ স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু জড় বা অনাত্মার স্বরূপটি কখনও স্পর্শ করিতে পারি না। ইহা অতীব বিচিত্র। স্বর্ণ বা প্রস্তর খণ্ড জড় (matter) নহে। কিন্তু উহাদের উপাদান কারণ যে জড় পদার্থ তাহাকেই 'ম্যাটার' বলা যায়। সেই অতীন্দ্রিয় জড় উপাদানটি কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র।

ইংরেজী ভাষায় 'ম্যাটার' (জড় বা অনাত্মা) যাহাকে বলে, সেই 'ম্যাটার' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস সকলেরই জানা আবশ্যক। ইহা ল্যাটিন ভাষার Materies (মেটিরিস্) শব্দ হইতে উৎপন্ন। এই ল্যাটিন্ শব্দের অর্থ কোন এক বস্তুর

'উপাদান'। প্রথমে এই শব্দটি বৃক্ষের গুঁড়ি বা গৃহাদি নির্ম্মানোপযোগী কড়িকাষ্ঠ, বরগা ইত্যাদি বস্তুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।

ক্রমশঃ এবম্প্রকার বিশেষ অর্থ হইতে সাধারণ সংজ্ঞাজ্ঞাপক ভাবে উহার অর্থ পরিবর্ত্তিত হয়—অর্থাৎ যে কোনও পদার্থকে বিভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত করিলে উহার রূপান্তরিত প্রত্যেক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয় বটে, কিন্তু ফলতঃ মূল পদার্থটি যাহা তাহাই থাকে। এই মূল পদার্থকে 'ম্যাটার' বলা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কাষ্ঠের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে, মূর্ত্তিটিকে 'মেটিরিস্' না বুঝাইয়া উপাদান কাষ্ঠকেই 'মেটিরিস্' বলিয়া বুঝাইত। এইরূপে প্রস্তর, লোহা প্রভৃতি ধাতু হইতে বিভিন্ন আকারের মূর্ত্তি গঠিত হইলে উহাদের মূল উপাদান পদার্থকেই 'মেটিরিস্' নামে অভিহিত করা হইত। তদনুসারে পরে যখন মানব হৃদয়ে প্রশ্ন উঠিল যে, এই জগৎ কোন্ বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত? উত্তরে বলা হইল যে, 'মেটিরিস্' বা 'ম্যাটার' হইতেই এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 'ম্যাটার' বলিতে বিশেষরূপে নিশ্চিত কোনও বস্তুকে বুঝাইতেছে না। সুতরাং এই শব্দটি কোনও অজ্ঞাত বস্তুকে বুঝায় যাহা হইতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়গুলি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অজ্ঞাত বস্তুটির সংজ্ঞা বা নাম দিবার জন্য 'matter' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী 'ম্যাটার' শব্দের ইহাই প্রকৃত অর্থ।

ইংরেজী ভাষায় চলিত কথোপকথনে কোন অজ্ঞাত বস্তুর

উদ্দেশ্যে 'ম্যাটার' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যেমন "what is the matter" ? কি ঘটিয়াছে ? "It does not matter" ইহাতে ক্ষতি নাই। "Important matter" আবশ্যকীয় বস্তু। "Decaying matter" পচা জিনিস ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে 'ম্যাটার' শব্দের অর্থ সেই অজ্ঞাত বস্তু যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় আকারবিশিষ্ট পদার্থের উপাদানস্বরূপ। সেই অতীন্দ্রিয় উপাদান কারণই 'জড়' বা 'অনাত্মা' শব্দসকল দ্বারা বুঝিতে হইবে। ইহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ) বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ অজ্ঞাত পদার্থ। ইহা যদিও আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তথাপি ইহা এই বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থে মূল উপাদানরূপে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

'দেশ' অথবা 'কাল' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'ম্যাটার' জড় বা অনাত্ম পদার্থ ঠিক্ তাহা নহে। তবে ইহা দেশকে ব্যাপিয়া থাকে এবং কালের অধীনে ইহার অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এই 'ম্যাটার' বা জড় পদার্থটি কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের পর্য্যায়ের (category ofcausality) মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। অর্থাৎ ইহা কার্য্যকারণ প্রবাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। ইহাকে 'কার্য্য' অথবা 'কারণ' বলা যাইতে পারা যায় না। এই সমস্ত ভাব 'ম্যাটার' 'জড়' বা 'অনাত্মা' শব্দের অর্থের মধ্যে নিহিত আছে। জড় বা অনাত্মা বলিলে দেশ, কাল, নিমিত্তের সহিত ইহার সম্বন্ধ কিরূপ তাহা মনে রাখিতে হইবে। যখন আমরা এই স্থূল বাহ্যজগতের

পদার্থসকল যে উপাদানে নির্ম্মিত তাহার বিষয় চিন্তা করি, তখন স্বতঃই আমাদের মনে এই ভাব উদিত হয় যে, উহা বিরাট্, মহান্, অদ্ভুত, অলৌকিক ও নিত্যপরিবর্ত্তনশীল শক্তি-বিশিষ্ট। কিন্তু আবার আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠে যে, সেই জগতের উপাদান 'ম্যাটার' যাহাকে আমরা জড় বা অনাত্মা বলি তাহা কোন্ পদার্থ? উহা এক অথবা বহু? উত্তরে বলিতে হয় যে, 'ম্যাটার,' জড় অথবা অনাত্ম পদার্থ একটিমাত্র; উহা বহু নহে। 'ম্যাটার' অনেক, একথা আমরা বলিতে পারি না। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন :—'ম্যাটার' জড় বা অনাত্ম পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা হয় তাহা অতি সহজভাবে বুঝাইতে গেলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যাহা দেশ বা আকাশ (space) ব্যাপিয়া থাকে এবং প্রতিরোধ-শক্তিসম্পন্ন তাহাই 'ম্যাটার,' জড় বা অনাত্মা। ইহা শূন্য আকাশ হইতে পৃথক; শূন্য আকাশে কোনপ্রকার গতির প্রতিরোধ হয় না।*

এখন জড়ের ও আকাশের বা দেশের (space) মধ্যে কি প্রভেদ তাহা বিচার করা যাউক। যাহার ব্যাপকত্ব অপ্রতিরোধ-কারী তাহাই 'আকাশ' বা দেশ, আর যাহা গতির প্রতিরোধক ও যাহা আকাশের বা দেশের মধ্যেই অবস্থিত তাহাই জড়, অনাত্মা। অর্থাৎ আকাশ বা দেশ এবং জড় বা অনাত্মা উভয়ই ব্যাপক। কিন্তু আকাশ বা দেশ সর্ব্বত্র ব্যাপক হইলেও উহা

* 'First Principles' by Herbert Spencer—p. 140.

অপ্রতিরোধী বা গতিকে বাধা দেয় না; পরন্তু জড়, অনাত্মা আকাশের বা দেশের মধ্যেই অবস্থান করে।

হার্বার্ট স্পেন্সার আরও বলেন যে, "জড় ও আকাশ এই দুইটি অবিশ্লেষ্য মূলতত্ত্বের মধ্যে প্রতিরোধ বা বাধা দেওয়া কার্য্যই জড়ের মুখ্যগুণ, এবং ব্যাপকত্ব গৌণগুণ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন আমরা কোনও বস্তু স্পর্শ করি তখন উহা আমাদের বাধা দেয় এবং হস্তের গতির প্রতিরোধক কিছু আছে ইহা আমাদের উপলব্ধি হয়। কিন্তু যখন আমরা সেই বস্তু স্পর্শ করিয়া হস্তপ্রসারণ করি, তখন এই বাধা বা প্রতিরোধের ভাব দেশের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।" তিনি আরও বলেন যে, "যাহা হইতে জড়ের বা অনাত্মার অস্তিত্বের ধারণা আমাদের হয়, তাহা একপ্রকার শক্তির কার্য্য বলিয়া আমাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা আমাদের মাংসপেশী সঞ্চালনের সময় তৎস্থিত সুপ্তশক্তির প্রতিরোধ করে, সেই প্রতিরোধক শক্তির কথা স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়। যে সুপ্তশক্তি ঐরূপ প্রতিরোধ করে তাহাকেই ব্যক্তশক্তি (force) বলা হয়। সুতরাং 'ম্যাটার', জড় বা অনাত্মা যাহাকে বলা যায় তাহা কেবল এই ব্যক্ত শক্তিগুলি দেশের সহিত একপ্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধমাত্র—ইহাই বুঝিতে হইবে।" তিনি আরও বলেন যে, "ম্যাটার ও তাহার গতি ঐ শক্তিগুলির বিভিন্নপ্রকার অভিব্যক্তি মাত্র। জড় ও অনাত্মা-রূপ স্থূল পদার্থগুলি বাহ্যিক শক্তিসমষ্টি ও আমাদের মানসিক

উপলব্ধি সমূহ একত্রে সংমিশ্রিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে।" প্রতিরোধ বা বাধা অনুভব করিবার জন্য এক সচেতন 'পুরুষ' থাকা আবশ্যক। এই অনুভব-করণক্ষম জ্ঞাতা (আত্মা) বিদ্যমান থাকিলেই প্রতিরোধমূলক শক্তিটি অনুভব করিতে পারা যায় এবং এই শক্তি হইতেই জড় বা অনাত্মা সম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের জন্মিয়া থাকে।

জড় বা অনাত্মা কাহারও দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ নহে। অসৎ বা শূন্য হইতে অনাত্মা বা জড়ের সৃষ্টি অথবা কোন কালে উহার অত্যন্তাভাব বা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ কেহ কখনও দেখেন নাই এবং কল্পনাও করিতে পারেন নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতানুসারে জড় অসৃষ্ট্য ও অবিনশ্বর। সংক্ষেপে বলিতে হইবে যে, 'ম্যাটার' (জড় বা অনাত্মা) অসৎ বা শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহার ধ্বংস বা বিলোপও সম্ভবপর নহে। জড়, অনাত্মার আরও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা আছে। পাশ্চাত্য প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ বলেন যে, যাহা পারস্পরিক আকর্ষণ শক্তি সম্পন্ন তাহাই 'জড়'। কিন্তু এই সংজ্ঞা হইতেও জড়ের যথার্থস্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, হয়ত আকৃষ্ট হইলে প্রত্যাকর্ষণ করিবার শক্তিসম্পন্ন কোনও পদার্থ থাকিতে পারে। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক আর্ণেষ্ট হেকেলও বলেন, "জড় বা অনাত্মা—অসীমরূপে ব্যাপ্ত হইয়া আছে এমন কোনও বস্তু বিশেষ এবং সর্ব্বভাব-গ্রাহিণী চিন্তাশক্তিই চৈতন্যময় আত্মা (Spirit)।"

এবম্প্রকার বিবিধ সংজ্ঞাগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, যে মূল উপাদানে এই স্থূল বাহ্যজগৎ নির্ম্মিত অথবা যাহা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং মন ও বুদ্ধি দ্বারা যাহা বোধগম্য হয় তাহাই জড় বা অনাত্মা। ইহা নিত্য জ্ঞেয়-স্বরূপ বিষয় (objective) ; আর চৈতন্যময় আত্মা (Spirit or mind) নিত্য জ্ঞাতাস্বরূপ বিষয়ী অথবা সকল বিষয়ের দ্রষ্টাস্বরূপ। এক্ষণে ইহার পার্থক্য এইভাবে বুঝিতে পারি যে, সচেতন আত্মাই জ্ঞাতা ও দ্রষ্টাস্বরূপ ; পক্ষান্তরে জড় বা অনাত্মা সর্ব্বদা দৃষ্ট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং জ্ঞেয় পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। একটি কর্ত্তাস্বরূপ এবং অপরটি কর্ম্মস্বরূপ। এতদুভয়ই পরস্পরের সম্বন্ধ সাপেক্ষ। একই বস্তুর অর্দ্ধাংশ এই স্থূল বাহ্যজগৎ, সমস্ত জড় বা অনাত্মা এবং উহার অপর অর্দ্ধাংশ মনোরাজ্য বা চৈতন্যময় আত্মা। সুতরাং জড়বাদীর মত— যাহা কেবল 'জ্ঞেয়' বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং বিষয়ী, আত্মা বা জ্ঞাতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাহা একদেশী ও অসম্পূর্ণ। জ্ঞাতা, আত্মা বা বিষয়ী আছে বলিয়াই জ্ঞেয় বিষয় বা অনাত্ম পদার্থের বিদ্যমানতা সম্ভবপর—এই সত্য জড়বাদ স্বীকারই করে না।

জড়বাদীদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ন্যায়যুক্তি-বিরুদ্ধ কারণ বিষয় ও বিষয়ী—জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এতদুভয়ের স্বরূপের বিভ্রমের উপর উহার ভিত্তি। জড়বাদ বলে যে, জড় বা অনাত্মা হইতেছে জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় কিন্তু আবার তৎসঙ্গে ইহাও

প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, এই জ্ঞেয় বিষয় হইতেই সেই জ্ঞাতা বিষয়ী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা কখনই হইতে পারে না। কারণ 'ক' কখনও 'ক' এর অভাব হইতে পারে না। জড় বা অনাত্মা, জ্ঞেয় পদার্থ বা জ্ঞানের বিষয় (objective)—এই ধারণাতে জড়বাদের আরম্ভ। কিন্তু পরিশেষে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে, এই জ্ঞেয়, জড় বা অনাত্মা বিষয় হইতেই বিষয়ী, জ্ঞাতাস্বরূপ আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রথমে জড়বাদ স্বীকার করে যে, যাহা উপলব্ধির বিষয় অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই জড় বা অনাত্মা; পরে ক্রমশঃ ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে যে, উহাই আবার বিষয়ী (যিনি অনুভবকর্ত্তা), উৎপাদক। এই সিদ্ধান্ত একেবারেই স্বমত-বিরোধী এবং অযৌক্তিক। জড়বাদ যেমন একদেশদর্শী এবং ভ্রমসঙ্কুল সেইরূপ অধ্যাত্মবাদ বা বিজ্ঞানবাদ যাহা অনাত্মা, বিষয় বা জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বলে যে, জগতের যাবতীয় বাহ্য বস্তু আমাদের মনের ভাব মাত্র, তাহাও একদেশীতা-দোষযুক্ত।

আধুনিক খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মবিজ্ঞান-সম্প্রদায়ের মতে সমস্ত বস্তুই মানসিক ভাব—সমূহ মাত্র; জড় বা অনাত্মা কিছুই নাই—এই মতও জড়বাদীদের মতের ন্যায় একদেশী ও ভ্রমাত্মক। দৃশ্য বা জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা বিষয়ী (আত্মা যিনি সর্ব্বসময়ে কেবল অনুভব কর্ত্তা) থাকিতে পারে না। যদি আমরা একের অস্তিত্ব স্বীকার করি তবে অপরটির অস্তিত্ব

আছে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং জার্ম্মাণ কবি ও দার্শনিক পণ্ডিত গেটে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন যে, চৈতন্যময় আত্মা না থাকিলে জড় বা অনাত্মা থাকিতে পারে না এবং উহা কার্য্যক্ষম হয় না; সেইরূপ জড় বা অনাত্মা না থাকিলে আত্মার অস্তিত্বই থাকে না।

বিশ্বব্যাপী "অখণ্ড সত্ত্বা" আত্মা ও অনাত্মা, বিষয়ী ও বিষয় এই দুই গুণযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই দুইটি যেন সেই এক অব্যক্ত অজ্ঞেয় নিত্যস্বরূপের দুই প্রকার অবস্থাভেদ মাত্র। এই এক সত্ত্বাকে বেদে "একং সৎ" বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা দিয়াছেন। ইউরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা "পারমার্থিক সত্ত্বা" বলিয়াছেন, ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সার ইহাকেই "অজ্ঞেয় সত্ত্বা" বলিয়াছেন, জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্যাণ্টের ইহাই "সর্ব্বাতীত সত্ত্বা"। প্রাচীন গ্রীক-দার্শনিক প্লেটো ইহাকেই "সর্ব্বোত্তম" আখ্যা দিয়াছেন এবং আমেরিকান দার্শনিক এমার্শন ইহাকেই "পরমাত্মা" বলিয়াছেন; আর বেদান্ত মতে ইনিই "ব্রহ্ম"; ইনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই সনাতন সত্যস্বরূপ—যাহা হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম, জড় বা অনাত্মা, আত্মা সমস্তেরই উৎপত্তি। ইহা "একমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয়; বহু নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রকার জাগতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ এই এক ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত এবং প্রলয় কালে সমস্তই সেই ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়। এই অনন্ত আধার স্বরূপ ব্রহ্মে মায়া বা

প্রকৃতি অভিন্নরূপে অবস্থিত ছিল এবং সেই প্রকৃতি হইতে প্রকাশমান যাবতীয় শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। এই প্রকৃতিকে আদ্যাশক্তি, মহামায়া, জগন্মাতা ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে আমরা জানিয়াছি যে, জগতের দৃশ্যমান শক্তিনিচয় পরস্পর আপেক্ষিকভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইহারা সেই সনাতন ব্রহ্ম ও তাহার নিত্যা প্রকৃতির অভিব্যক্তি মাত্র।

উপনিষদ্ বলেন:—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।" এই এক আকর হইতে প্রাণ, সর্ব্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়া, ইন্দ্রিয় শক্তি, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু এবং ভৌতিক শক্তিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে ও নানাভাবে, নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

ইহাই অদ্বৈতবাদ। বর্ত্তমানকালে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক আর্ণেষ্ট হেকেল প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ স্বীকার করেন যে, ঐ নিত্য বস্তুই জড়, চেতন এবং সর্ব্বপ্রকার শক্তিসমূহের উদ্ভবের হেতু। তাঁহারা বেদান্তের মহান্ সত্য "এতস্মাজ্জায়তে ইত্যাদি" স্বীকার করিয়াছেন। সেই এক অনন্ত ব্রহ্ম হইতে এক দিকে জীবনীশক্তি অর্থাৎ প্রাণ, মন, মানসিক ক্রিয়াসমূহ এবং ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহ-সমন্বিত জীবাত্মা উৎপন্ন হইয়াছে, অপর দিকে জড়রাজ্যান্তর্গত দেশ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, আপঃ, (তরল), পৃথিবী অর্থাৎ কঠিন (Solid) প্রভৃতি স্থূল পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। এক কথায়, সেই অনন্ত ব্রহ্ম হইতে একদিকে

জীবাত্মার ও অপরদিকে অনাত্মা বা জড়ের বিকাশ—বেদান্তের এই অদ্বৈত-তত্ত্ব পাশ্চাত্য আধুনিক বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণও সমর্থন করিতেছেন। 'ম্যাটার' অথবা জড় পদার্থকে অতি সুক্ষ্মাবস্থায় বিশ্লেষণ করিলে তাহা উহার আধারভূত সেই অসীম ব্রহ্ম-সত্বাতে পরিণত হইয়া থাকে। সেই জন্য বেদান্ত বলিয়াছেন যে, এই অসীম অনন্ত ব্রহ্ম-সত্বাই নিখিল বিশ্বের অনাত্মা এবং আত্মা, জড় ও চেতন এই দুই ভাবের মূলে বিদ্যমান। সেই ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। যদ্যপি ইহা এক ও অদ্বিতীয় তথাপি ইহা অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তি প্রভাবে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ।

এই জগৎ কেবলমাত্র অচেতন পদার্থে রচিত নহে অথবা উহা পরমাণু সমষ্টির সমবায়ের ফলও নহে। এযাবৎ কাল পাশ্চাত্য প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ, রাসায়নিক এবং অপরাপর জড়বাদী-গণ বিশ্বাস করিতেন যে, পরমাণুসকল প্রত্যেকটি অবিভাজ্য পদার্থ; উহারা এই অনন্ত আকাশ সমুদ্রে ভাসিতেছে এবং পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তির অধীন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই-বারকালে স্বতঃই যাবতীয় প্রাকৃতিক উপাদান উৎপাদন করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সুবিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জে, জে, টমসন্ বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন, যে তথাকথিত অবিভাজ্য পরমাণুকেও সুক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ সুক্ষ্মতর অংশকেই 'ইলেক্ট্রণ' ও 'প্রটণ' বা বিদ্যুতিন্

বা বিদ্যুৎমাত্রা বলে; এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকদিগের তন্মাত্রা বা শক্তিকেন্দ্র ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যদি পরমাণু-গুলি 'ইলেক্ট্রণে'র সমষ্টি হয় এবং 'ইলেক্ট্রণ'গুলিই তন্মাত্রা বা শক্তিকেন্দ্র হয় তাহা হইলে ইহাদের আবাস স্থান কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত বলেন যে, তাহারা পরিদৃশ্যমান শক্তি-সমূহ উদ্ভাবনকারী অব্যক্ত প্রকৃতির আধার সেই ব্রহ্ম স্বরূপ অনাদি অনন্ত কারণ সমুদ্রের মধ্যেই অবস্থিত। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, 'ম্যাটার' জড় বা অনাত্মা ও শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ মহাকারণের সহিত কিরূপ অভিন্নভাবে সম্বদ্ধ। এক অংশ হইতেছে ম্যাটার, বা জড়, জ্ঞেয়, বিষয় এবং অপরাংশ হইতেছে আত্মা—যাহাকে জ্ঞাতা, বিষয়ী বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ম্যাটার বা জড় অবিনাশী, অনাদি ও অসৃজ্য এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত। ম্যাটার বা জড় ও শক্তি নানারূপে পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইলেও ইহাদের ধ্বংস বা অত্যন্তাভাব কোন কালে হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জড় ও শক্তি অর্থাৎ এই বিশ্বের অর্দ্ধাংশ যদি অবিনাশী ও অসৃজ্য হয়, অপরার্দ্ধের অর্থাৎ চেতন আত্মার ধর্ম্ম কিরূপ হইবে? আত্মা কি বিনাশী ও সৃষ্ট পদার্থ? ইহার সঙ্গত উত্তর এই যে, একার্দ্ধ যাহা জ্ঞেয়, বিষয় বা জড় তাহা যদি অবিনাশী ও অসৃষ্ট হয়, তবে সেই একই বস্তুর অপরার্দ্ধ চৈতন্যময় আত্মা বা বিষয়ী কিরূপে সৃষ্ট এবং বিনাশী হইতে পারে? ইহা ন্যায়যুক্তির বিরুদ্ধ ও একেবারে অসম্ভব। সুতরাং

জ্ঞাতা বা আত্মার স্বরূপ নিশ্চয়ই অসৃষ্ট ও অবিনাশী স্বীকার করিতে হইবে। যদি জ্ঞেয়, জড় বা অনাত্মা 'নিত্য' অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত হয় তাহা হইলে উহার ঐ ধর্ম্ম সম্ভবপর করিবার জন্ত জ্ঞাতা আত্মাকে নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞাতা স্বরূপ আত্মা নিত্য না হইলে জড় ও শক্তি যে নিত্য ইহা কে জানিবে? এই প্রশ্নের উত্তর এবং ইহার মূল-তত্ত্বটি পাশ্চাত্য বিভিন্ন দেশের সুবিখ্যাত জড়বাদী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ আলোচনা করেন নাই। জ্ঞেয়, বিষয়, জড় ও শক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই জ্ঞাতা বা আত্মার নিত্যত্ব প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে। একের নিত্যত্বের উপর অপরটিরও নিত্যত্ব নির্ভর করে—এই দুইটির মধ্যে যদি একটি অনিত্য হয় তাহা হইলে অপরটিও অনিত্য হইবে; এবং দুইটির সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং আত্মা এবং অনাত্মার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ-বিচারের চরম সীমায় দেখা যায় যে, উভয়েই অবিনাশ্য, অসৃজ্য এবং নিত্য। একই চুম্বকের একটি প্রান্তের গুণ যদি নিত্য হয়, তবে অপর প্রান্তটির গুণও স্বভাবতঃ নিত্যই হইবে; অধিকন্তু চুম্বকের মধ্যস্থল অর্থাৎ উভয় প্রান্তগত ধর্ম্মের সন্ধিস্থলও নিত্যই হইবে। এই নিখিল বিশ্ব যেন একটি বিরাট চুম্বক উহার একটি প্রান্ত জড় বা অনাত্মা; অপর প্রান্তটি আত্মা এবং সন্ধিস্থলটি সেই নির্গুণ সত্ত্বা অর্থাৎ ব্রহ্ম। এই কারণ বশতঃ জড় বা অনাত্মা, আত্মা এবং ব্রহ্ম—এই তিনই নিত্য বস্তু।

বেদান্তশাস্ত্রে চৈতন্যময় বিষয়ী, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা স্বরূপকে আত্মা বলা হয়। ইহাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। ইহা অনাদিকাল হইতে আছে এবং ভবিষ্যতে অনাদিকাল পর্য্যন্তও থাকিবে। কোন বস্তুই ইহার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগতের আকার সকল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু আত্মার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন কখনও ঘটিবে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্ত্তনীয়। সেই কারণ গীতায় উক্ত হইয়াছে ;—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"—অস্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে দ্রব করিতে পারে না, এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, অবিকার্য্য এবং অবিনশ্বর ; মৃত্যুকালেও ইহার নাশ হয় না। যাহা কিছু দেশ ও কালের অধীন তাহাই মরণশীল অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন। যে সকল বস্তুর আকার আছে, তাহার মৃত্যুও আছে। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" জন্ম হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই ধ্বংস আছে। আমাদের শরীরের জন্ম হইয়াছে, সেই জন্য ইহার মৃত্যু হইবে। কারণ, দেহের আকার দেশ ও কালের অধীন। কিন্তু আত্মার মৃত্যু হইতে পারে না, কারণ ইহা অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত এবং দেশকালাতীত অর্থাৎ দেশ ও কালের অধীন নহে। যদি আমাদের আত্মার উৎপত্তি বা জন্মের বিষয় অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে আমরা কখনও

উহার উৎপত্তির সন্ধান পাইব না। সুতরাং আত্মা আদি-রহিত এবং অন্তহীন। যে সমস্ত পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদের পরিবর্ত্তন হইবে এবং কালে তাহাদের নাশও হইবে; কিন্তু আত্মা চিরকালই একই ভাবে থাকিবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই চৈতন্যময় আত্মা এক অথবা বহু? এই একই প্রশ্ন জড় বা অনাত্মা সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারেও যে, উহা এক অথবা বহু? আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে জ্ঞেয়, বিষয়, জড় বা অনাত্মা যদিও দেশ এবং কালের অধীন হইয়া নানাভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে তথাপি উহা পরমার্থতঃ একই বস্তু। বেদান্তমতে জ্ঞেয়, বিষয় যেমন একটিমাত্র সেইরূপ জগতের জ্ঞাতা, বিষয়ী বা আত্মা একটি-মাত্র আছে। সেই সর্ব্বব্যাপী জ্ঞাতা বা পরমাত্মা এই নিখিল বিশ্বের আত্মা স্বরূপে বিদ্যমান; এবং ক্ষুদ্র জীবাত্মাসমূহ তাঁহারই ক্ষুদ্র অংশরূপে প্রকাশমান হইতেছে।* যে পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা বিরাটপুরুষ—জীবাত্মারূপ অংশ সকলের পূর্ণ সমষ্টি, সেই বিরাট পুরুষই অনাদিকাল হইতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বিষয়ী এবং জ্ঞাতা। তিনিই একমাত্র বিশ্বাত্মা, যাহাতে জীবাত্মাসমূহ অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। তিনিই এক অদ্বিতীয় অনন্ত-সত্ত্বারূপ সমুদ্র, যাহাতে অসংখ্য আবর্ত্তের ন্যায় ব্যক্তিগত জীবাত্মা সমূহ বিরাজ করিতেছে। এই বিরাট পুরুষই প্রথমজঃ হিরণ্যগর্ভ বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণিত

* "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"—গীতা।

হইয়াছেন—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে বিশ্বস্ত ধাতা পতিরেক আসীৎ" অর্থাৎ ইনি বিশ্বের বিধাতা ও পতিরূপে ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই নির্গুণ পরব্রহ্মের সর্ব্ব-প্রথম এবং সর্ব্বোচ্চ বিকাশ—সগুণ-ব্রহ্ম। ইনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। ইহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি ক্রম-বিকাশ দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রসব করিয়াছেন। এই ভাবটি গীতাতে বলা হইয়াছে,—"মম যোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং॥" ইনি জ্ঞাতা, বিষয়ী, আত্মা এবং চৈতন্যকে জ্ঞেয়, বিষয়, অনাত্মা ও জড় হইতে পৃথক করিয়াছেন।

"যতো বা ইমানিভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।"
—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

ইহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতেই অবস্থান করিতেছে এবং অবশেষে ইহাতেই প্রবেশ করিবে। ইনি সর্ব্ব-শক্তিমান। সমস্ত জীব-সমষ্টির যত শক্তি থাকে, তদপেক্ষা ইনি অধিকতর ক্ষমতাশালী। আমাদের শক্তি অতিক্ষুদ্র—আমাদের জ্ঞান যেরূপ সীমাবদ্ধ, আমাদের শক্তিও তদ্রূপ সীমাবদ্ধ; কিন্তু পরমেশ্বরের মহতী শক্তির কোন সীমা নাই। ইনি সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন এবং আমাদের প্রত্যেক আত্মার পশ্চাতেই অবস্থান করিতেছেন। ইনি জ্ঞানের অনন্ত আধার; ইনিই আমাদের আত্মার আত্মা।

এই পরমেশ্বরের পূজা ও ধ্যান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য এবং ইহা করিলেই আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং।
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥"

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

ইনি সমস্ত অনিত্য নামরূপাদির মধ্যে একমাত্র নিত্যবস্তু। ইনিই সমস্ত চেতন পদার্থের মধ্যে একমাত্র চৈতন্যের আকর-স্বরূপ ; আবার ইনিই সেই এক বস্তুকে বহুভাবে প্রতিভাত করান এবং সকল জীবের অন্তরস্থিত সকল কামনা পূর্ণ করেন। যিনি ইহাকে হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি এই জীবনেই নিত্যা শান্তি লাভ করেন।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়গোচর স্থূল এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম জগতের সমস্ত পদার্থই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই পূর্ণস্বভাব অনন্ত ব্রহ্ম হইতে পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও সেই অনন্ত ব্রহ্ম। ইহাতে ব্রহ্মের পূর্ণতার কোন হানি হয় না। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি॥

আত্মা ও বিজ্ঞান

ভারতবর্ষে ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা আত্মা-বিষয়ক জ্ঞানের কথাই সচরাচর বহুলভাবে জনসমূহের মধ্যে আলোচিত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানই সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বা পরমপুরুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। সাধারণতঃ 'আত্মা' বলিতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং', 'আমি'কেই বুঝিয়া থাকি; 'আত্ম-জ্ঞান' বলিতে কেবল আমাদের এই 'অহং' বা 'আমি'র জ্ঞানকে বুঝায় না। আমাদের শরীরস্থিত 'অহং' বা জীবাত্মাটিই কার্য্য-কর্ত্তা বা চিন্তাকর্ত্তা এবং জ্ঞাতারূপেই আছেন। যিনি শরীর এবং মনের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন তিনিই 'অহং' বা 'জীবাত্মা' বলিয়া বিদিত; কিন্তু এই জীবাত্মা সর্ব্বজ্ঞানের আকর—সেই পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র এবং পরমাত্মার চিৎ-শক্তি বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে জীবাত্মা শক্তিমান্ হইয়া উঠে এবং শারীরিক ও মানসিক কার্য্যসমূহ করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান বলিতে কেবল দেহাত্মাভিমানী পশুতুল্য অহং জ্ঞান না বুঝিয়া উহার সহিত উচ্চতর সেই মহান্ আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। জীবের যথার্থ স্বরূপ এই শেষোক্ত আত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলা যাইতে পারে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" সুতরাং উহা এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূলদেশে অবস্থিত

বিশ্বাত্মার সহিত অভিন্ন। সেই বিশ্বাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের পারমার্থিক সত্ত্বা ও দেশকালাতীত পরমাত্মা নামে অভিহিত হন। ইনি আবার নিরাকার অপরিবর্ত্তনশীল পরব্রহ্ম।

যখন ইনি ব্যষ্টিভাবে বা 'অহমস্মি' ইত্যাকার ক্ষুদ্র 'আমি' জ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হন, তখন ইহাকে জীবাত্মা বলা হয়। ইহাই আবার যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞেয় পদার্থরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন তখন সেই অবস্থাকেই জড় পদার্থ বলা হয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মকে জড় পদার্থ বা জীবাত্মা বলা যায় না। ইনিই অন্তর্য্যামীরূপে জীবাত্মার পশ্চাতে অবস্থান করিতেছেন এবং তজ্জন্য ইনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মা। যখনই আমাদের এই আত্মানুভূতি হইবে তখনই আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে এবং তখনই এই বহির্জগতের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা বোধগম্য হইবে। নিজ স্বরূপ বা আত্মাকে সাক্ষাৎকার করাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আত্মবিনাশ সাধনই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য—কিন্তু উহা ঠিক্ নহে। বেদান্তের মতে প্রকৃত আত্মাকে কখনও ধ্বংস করা যাইতে পারে না। যদি উক্ত আত্মবিনাশ সাধনই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে আত্মা পরিবর্ত্তনশীল ও বিনাশী হইতেন এবং আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইতেন না। পক্ষান্তরে বেদান্ত দর্শন হইতে এই শিক্ষা পাই যে, প্রকৃত আত্মা সর্ব্বতোভাবে অপরিবর্ত্তনশীল ও অবিনাশী। ইহাই যদি হয়, তবে কি প্রকারে আত্মার অত্যন্তাভাবের কথা

উঠিতে পারে। ব্রহ্মের বিনাশসাধন যেরূপ অসম্ভব, আত্মার বিনাশসাধনও সেইরূপই অসম্ভব। সুতরাং আত্মবিনাশ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইতে পারে না।

একমাত্র আত্মজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা চরম সত্যের উপলব্ধি করিতে পারি এবং পূর্ণতাও লাভ করিতে পারি। বেদে ইহাই উচ্চতম জ্ঞান বলিয়া বিদিত। যখন সক্রেটিস্ ডেল্‌ফি নগরের মন্দিরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ জ্ঞান কি?" তিনি প্রত্যুত্তরে দৈববাণী শুনিয়াছিলেন "তোমার আত্মাকে জান।" অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে ভারতে এই আত্মজ্ঞানের গুণ কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বেদান্ত অর্থাৎ বেদের জ্ঞান-কাণ্ড বলেন যে, এই আত্মজ্ঞানই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। যদি আমরা ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদের আত্মাকে সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে। আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই প্রশ্ন জাগাইতে হইবে যে, আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি? মৃত্যুর পরেই বা আমাদের কি হইবে? এইগুলি অতি আবশ্যকীয় প্রশ্ন। সাধারণ লোকে এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে না, কারণ তাহাদের মন বহির্জগৎ সংক্রান্ত ব্যাপারেই মজিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি, যাঁহার বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, তিনি বহিঃপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যতক্ষণ না ইহার মৌলিক তত্ত্ব জ্ঞাত হয়েন ততক্ষণ ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইতে থাকেন। নিজের এবং বিশ্বের

যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধিদ্বারা উপরি উক্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি এই জড় জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ যতই স্তরে স্তরে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তিনি পরমার্থ সত্যের নিকটবর্ত্তী হয়েন এবং পরিশেষে সেই সত্য উপলব্ধি হইলেই তিনি দেখিতে পান যে, সেই সত্য বস্তু তাঁহার আত্মা হইতে অভিন্ন। কারণ আত্মাই বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। এই পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সমন্বিত বাহ্য জগৎকে একটি সুবৃহৎ বৃত্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে—এই বৃত্তের পরিধি যেন স্থূল জড় পদার্থসমূহ এবং ইহার কেন্দ্র যেন আত্মা।

বেদান্তানুসারে এই আত্মা কখনও সীমাবদ্ধ নহে—ইনি অসীম; ইনি আবার অনন্ত ও অবিচ্ছিন্ন; কারণ, ইনি দেশকালাতীত। কালের দ্বারা ইহাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না—বা দেশের দ্বারা ইহার ব্যাপ্তি বুঝিতে পারা যায় না। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মতে ঈশ্বরই এই নিখিল বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু বেদান্তের মতে আত্মাও এই নিখিল বিশ্বের কেন্দ্র স্বরূপ এবং আত্মা ও ঈশ্বর অভিন্ন। যে মুহূর্ত্তে আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা বুঝিতে পারি যে, এই আত্মাই সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং বহুদূরবর্ত্তী গ্রহ, যেখান হইতে এই পৃথিবীতে আলোকরশ্মি আসিতে শত-সহস্র বৎসরেরও অধিক সময় লাগে—ব্যাপিয়া রহিয়াছে। পাঞ্চভৌতিক জগতে বা মনোরাজ্যে যেখানেই কোন প্রকারের

অস্তিত্ব আছে সেখানে আত্মার প্রকাশ আছে। যে চৈতন্যের দ্বারা আমরা বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি, এবং যাহা দ্বারা আমাদের দেহ আছে, ইন্দ্রিয় আছে ও মনের শক্তি আছে এইরূপ অনুভূতি হয় তাহাই আমাদের প্রকৃত আত্মা। ইহা আমাদের হইতে দূরে অবস্থিত না থাকিলেও আমাদের মন ও বুদ্ধির অগোচর। শুক্ল যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদের চতুর্থ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,* আত্মা সতত একরূপ ও স্পন্দনবর্জ্জিত অর্থাৎ নিশ্চল; আবার ইহা মন অপেক্ষাও সমধিক বেগবান্। ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। সেই আত্মা নিশ্চল হইলেও অতি দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন। এই আত্মাই মানসিক ক্রিয়াসমূহের, ইন্দ্রিয়-শক্তিরাজির এবং প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের মূল কারণ।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানি যে, এই জড় জগৎ প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের সংযোগেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রকৃতির স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। জড়-জগৎ ইহার বিশেষ প্রকার স্পন্দনাবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুর কম্পন বা স্পন্দন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে।

---

* অনেজদেকং মনসো জবীয়ো,
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ,
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥৪॥

—ঈশোপনিষৎ।

যাহা আমাদের নিকট উত্তাপ, আলোক, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রস বা ইন্দ্রিয়ানুভূতিযোগ্য কোনও বিষয় বলিয়া পরিচিত তাহা উপরি উক্ত সেই অজ্ঞাত প্রকৃতির স্পন্দনাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সার উইলিয়ম্ ক্রুকস্ বলেন, "এক সেকেণ্ডে বত্রিশটি বায়ুর কম্পন হইতে শব্দ প্রথম কর্ণগোচর হয় এবং যখন এই কম্পনের হার প্রতি সেকেণ্ডে তেত্রিশ হাজারের কিছু কম হয় তখন আর শব্দ কর্ণগোচর হয় না। উত্তাপ ও আলোকরশ্মির কম্পন এত দ্রুত যে, উহা প্রায় ধারণার মধ্যেই আইসে না। পঞ্চদশটি রাশির দ্বারা তাহাদের কম্পনের হার (প্রতি সেকেণ্ডে) নিরূপিত হয়; আবার সম্প্রতি 'রেডিয়ম্' নামক একটি মৌলিক ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তাহার কম্পনের সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে নব্বই লক্ষের দশ লক্ষ গুণের দশ লক্ষ গুণ অপেক্ষা অধিক ধার্য্য হইয়াছে।" সমস্ত জগৎটাই পরমাণুর কম্পন বিশেষ। কিন্তু এই কম্পন-রাজ্যের বাহিরে এবং জ্ঞান, বোধ ও বুদ্ধির মূলে সেই এক পরমার্থ সত্য বা আত্মা বিরাজ করিতেছেন। এবং এই আত্ম-চৈতন্যের সাহায্যেই কম্পন বা স্পন্দন বলিয়া কোনও যে অবস্থা আছে তাহা আমরা জানিতে পারি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই জগৎ স্পন্দনরাশি ভিন্ন কিছুই নহে, তাহা কে জানিতে পারিল? স্পন্দনই কি আপনাকে জানিতে পারিল। না, তাহা হইতেই পারে না। "গতি হইতে গতি ভিন্ন অন্য কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না।"—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম এবং এই নিয়ম আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সমর্থন করেন।

সুতরাং গতি হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। গতি বা স্পন্দনের ফল জ্ঞান নহে—উহা অন্য কিছু পদার্থ যাহা আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করিয়া গতি বা স্পন্দনকে জানাইয়া দেয়।

ঈশোপনিষৎ বলেন, "অনেজদেকং,"—"যাহা স্পন্দনরহিত, তাহাই আত্মা"। নিজের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান কর এবং দেখ কোথায় সেই স্পন্দনরহিত বস্তু, যাহা সমস্ত স্পন্দনের ও কার্য্যের জ্ঞাতা—অথচ স্বয়ং স্পন্দনরহিত। ইহা মন অপেক্ষাও বেগবান্ ("মনসো জবীয়ো")। আমরা জানি যে, জগতের মধ্যে মনই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। চিন্তাশক্তি (Thought) বিদ্যুৎ অথবা অন্য কোন পার্থিব শক্তি অপেক্ষা দ্রুতগামী। ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সার উইলিয়ম ক্রুক্স্ বলেন, "মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার কম্পনগুলি যে কেন্দ্র হইতে বাহির হয়, সেই স্থানে ঐ কম্পনের কোনও প্রকার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে; কারণ উহা অতি সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের দ্বারা উৎপন্ন হয়"। তিনি আরও বলেন, "যদি আমরা এইরূপ কোনও শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, ঐ শক্তি প্রতি সেকেণ্ডে ইংরাজী সংখ্যা হিসাবে সহস্র সহস্র ট্রিলিয়ন*বার স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে এবং ইহার উপর আমরা যদি আরও এই ধারণা করি যে, এই কম্পনগুলির বেগ তাহাদের গতির ক্ষিপ্রতার সহিত সমানভাবে চলে তাহা হইলে একটি চিন্তাপ্রবাহ সময়ের অতি ক্ষুদ্রতম

* একের ডাইনে ১২টী শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহাকে ট্রিলিয়ন বলে।

অংশের মধ্যেই পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে”।

আমরা এখান হইতে ইংলণ্ড কিম্বা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সহিত বেতার বার্ত্তা অবলম্বনে অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদ আদান প্রদান করিতে পারি ; কিন্তু এই বেতারবার্ত্তার গতি অপেক্ষা চিন্তাপ্রবাহের গতি আরও দ্রুত। এই স্থানে উপবিষ্ট যে কোনও ব্যক্তির মন বরাবর সূর্য্য বা সূর্য্যমণ্ডল ছাড়াইয়া, যেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ যাইতে পারে না এইরূপ অসীমের দেশে যাইতে পারে এবং এই কার্য্য একটি পলক মধ্যেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। ‘সময়’ বা ‘কাল’ বস্তুটি মনের মধ্যেই বর্ত্তমান। ‘সময়’ বা ‘কাল’ বলিতে চিন্তাধারার ক্রমকেই বুঝায়। একটি চিন্তার পর আর একটি চিন্তার উদয় হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশকেই ‘সময়’ বা ‘কাল’ বলে। সুতরাং ইহা মনোরাজ্যের ক্রিয়ার অধীন। এই মন অপেক্ষা যাহা বেগগামী তাহাই প্রকৃত আত্মা। আমাদের প্রকৃত আত্মা চিন্তা প্রবাহ অপেক্ষা দ্রুতগমনশীল। মন (চিন্তা ধারা) যেখানে যাইতে পারে না, আত্মা সেখানেও যাইতে পারেন। আত্মা সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করেন। এই মনের পশ্চাতেই আত্মা অবস্থান করিতেছেন সুতরাং মনের ক্রিয়া সমূহ অপেক্ষা আত্মার তৎপরতা ক্ষিপ্রতর ও দ্রুততর। জ্ঞাতাস্বরূপ আত্মার সাহায্য ব্যতিরেকে মন কোথাও যাইতে পারে না। আত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেই মন একেবারেই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে।

"নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।"—"ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না ; আত্মা অতীন্দ্রিয় ; সেই জন্য আত্মা ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করেন।" ইন্দ্রিয়গণ আত্মার রহস্য ভেদ করিতে পারে না বা উহাদের শক্তিসমূহ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতে অক্ষম ; কারণ, উহারা দেশ ও কালের দ্বারা আবদ্ধ এবং যিনি দেশ ও কালের জ্ঞাতা তিনি অবশ্যই ইন্দ্রিয়রাজ্যের বাহিরেই অবস্থান করিবেন। যখন আমরা সূর্য্যকে দেখি তখন ঐ দৃষ্টি আমাদের 'অহং' জ্ঞানের বা আত্ম-চৈতন্যের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ কিছু দেখিতে হইলে "আমরা কিছু দেখিতেছি" এই ব্যাপারটি আমাদের মনে প্রথমে জাগরূক্ হওয়া প্রয়োজন। আবার এই জ্ঞানোদয় হওয়াও আত্মার উপরেই নির্ভর করে। জ্ঞান, চৈতন্য ও বুদ্ধির মূল কারণ যে আত্মা সেই আত্মা হইতে মন ও চক্ষু বিচ্ছিন্ন হইলে সূর্য্য দৃষ্ট হইবে না। ঐ জ্ঞান ও চৈতন্যের কারণ যে আত্মা তাহারই শক্তিতে আমাদের মন ক্রিয়াশীল হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে এবং আমাদের দেহ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। তজ্জন্য ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন যে, "আত্মা সচলও বটে, আবার নিশ্চলও বটে ; অতি দূরবর্ত্তী হইয়াও অত্যন্ত সন্নিকটে আছেন। তিনি নিখিল জগতের অন্তরে ও বহির্ভাগে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন"।* যখন দেহ

* তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥—ঈশোপনিষৎ ॥

একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করে, তখন আমাদের চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকে চলনশীল বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে নিশ্চল, কারণ আত্মা যাইবেনই বা কোথায় ? আত্মা কোথাও ত যাইতে পারেন না। যখন আমরা একটি ঘটকে একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাই তখন ঘটাভ্যন্তরস্থ আকাশকে সচল বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঘটাকাশ কি চলিতেছে ? না, তাহা নহে। তবে যে বস্তুটি স্থানান্তরিত হইতেছে তাহা কি ? তাহা আমরা জানি না। ঘটের আকৃতিটি স্থানান্তরিত হইতেছে বলিয়াই অনুমান হয় ; কিন্তু সেই আকৃতিটি আবার সীমা-বদ্ধ আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, "যদি আকাশ অচল হয় তবে সীমাবদ্ধ আকাশ বা ঘটের আকৃতিবিশেষও অচল"। ইহা প্রহেলিকার ন্যায় মনে হয় এবং যখনই আমরা ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করি তখন পদে পদে সমস্যা জটিল হইয়া পড়ে।

জীবনের সমস্ত ব্যাপারই রহস্যময় ও প্রহেলিকাপূর্ণ। বাহ্য প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহার কোন মীমাংসা পাওয়া যায় না ; বরং আরও জটিলতা আসিয়াই উপস্থিত হয়। বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা বিশেষ সাহায্য পাই না—ইহার দ্বারা কিছুদূর আমরা অগ্রসর হইতে পারি বটে কিন্তু উহা নিরুপায় অবস্থায় আমাদের কোন এক স্থানে ছাড়িয়া দেয়। এবং তাহার পর কি করিতে হইবে তাহা বলে না ও মীমাংসার কোন পথ দেখাইয়া দেয় না। আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞানের অবস্থাই এইরূপ।

কিন্তু এই আপেক্ষিক জ্ঞান যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা সেই এক চরম জ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সে যাহা হউক, আপেক্ষিক জ্ঞানের দ্বারা এই বিশ্বজগতের রহস্য ভেদ করিতে পারা যাইবে না। যদি এই জগতের মূলে যে সত্য পদার্থ আছে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে বাহ্য প্রকৃতির রাজ্য ছাড়াইয়া সেই এক অনন্ত জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রহস্যোদ্ঘাটনের উপায় খুঁজিতে হইবে। এই প্রকৃতিকে সংস্কৃত ভাষায় 'মায়া' বলা হয়। এই মায়াবশেই আমাদের যত ভ্রম হয়; অথচ এই মায়ার রাজ্যেই আমাদিগকে বাস করিতে হয় এবং আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ঐ মায়া বা প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বাহ্য প্রকৃতিতে আমরা যত মনোনিবেশ করিব, ততই আমাদের ভ্রম হইবে এবং তজ্জন্য আমরা যথার্থ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব না। বৈজ্ঞানিকগণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন বটে কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট অর্থাৎ তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারা সমস্যার কোনই মীমাংসা হয় না। বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেক বস্তুর সর্ব্বশেষ গন্তব্যস্থান অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই স্থলে বেদান্ত বলেন যে, কেবল বহিঃপ্রকৃতি আলোচনা না করিয়া আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা কর, তাহা হইলেই সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে এবং পরম সত্য লাভ করিবে।

যখন দেহটি গতিশীল হয় তখন মায়া দ্বারা অনুমিত হয় যে,

আত্মাও গতিশীল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মা অচল। আবার 'মায়া' দ্বারা ইহাও অনুমিত হয় যে, আমাদের আত্মা বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের যত কিছু আছে তাহাদের মধ্যে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। আমাদের শরীর ও মন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে আত্মা নিকটতর। এক কথায় আমাদের আত্মা বিশ্বের সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা আমাদের সমীপবর্ত্তী। এই কারণে ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন, "তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ॥৫॥ ইহা প্রত্যেক বস্তুর অন্তর-প্রদেশেও আছেন, আবার প্রত্যেক বস্তুর বহিঃপ্রদেশেও আছেন। উহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? যদি আত্মা কোন বস্তুর অভ্যন্তর প্রদেশে থাকেন তাহা হইলে আবার সেই বস্তুর বহিঃপ্রদেশে তাঁহার থাকা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু দেশ বা আকাশ ভিতরে ও বাহিরে দুই স্থলেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘরকে মনে করা যাউক। ঘরটি চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দেশ বা আকাশ বস্তুটি ঘরের মধ্যেও আছে আবার বাহিরেও আছে ; কিন্তু প্রাচীরগুলি কি? উহারা কি দেশ বা আকাশ হইতে বিভিন্ন? না, তাহা নহে। প্রাচীরগুলি সীমাবদ্ধ আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং আকাশের সাহায্যেই বিদ্যমান আছে। সুতরাং উহাকেও আকাশ বলিতে হইবে। প্রাচীরস্থ আকাশ খণ্ড ঘরের মধ্যস্থিত আকাশটিকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি উহা ঐরূপে আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে? ইহার উত্তরে 'না' বলিতে

হয়। গৃহমধ্যস্থ আকাশ বাহিরেও ব্যাপ্ত আছে। আমরা কি এই অনন্ত আকাশকে সীমাবদ্ধ করিতে পারি? কখনই না। এইরূপে মন দ্বারা আমাদের আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে আমরা অকৃতকার্য্য হই; কারণ, মন এত বড় নহে বা এত শক্তিশালী নহে, যে উহা ব্যাপক আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবে। ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ এই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না, পাঞ্চভৌতিক আকারবিশিষ্ট কোন পদার্থ দ্বারা ইহাকে ভাগ করা যায় না; কারণ ইহারা প্রত্যেকেই আত্মার সত্ত্বাতেই সত্ত্বাবান্। এই আত্মাকে যখন যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা যায় তখন ইহাকে অসীম ও অনন্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা বলিয়া থাকি যে, আমরা সসীম জীব, কিন্তু বাস্তবিক আমরা তাহা নহি। কেবল একমাত্র অসীম ও অনন্ত সত্ত্বা বিদ্যমান আছেন যিনি নানাবিধ সান্ত ও সসীম আকারের মধ্য দিয়া প্রকাশমান হইয়াছেন। এই সমস্ত সসীম আকারগুলি আকাশেই অবস্থান করে; ইহারা আকাশের বাহিরে অবস্থান করিতে পারে না। সেইরূপ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জীব সেই অনন্ত আকাশ সদৃশ একমাত্র নির্ব্বিশেষ আত্মার পারমার্থিক সত্ত্বাতে বিরাজ করে।

"যে ব্যক্তি আত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন তিনি কাহারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না।"* অর্থাৎ যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে আত্মা

---

* যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬॥—ঈশোপনিষৎ॥

হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন, যিনি সর্ব্বত্র সকল পদার্থেই বিমল আত্মার সদ্ভাব প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় বস্তু আর কিছুই নাই। ঘৃণা উদ্ভূত হয় অসম্পূর্ণ আপেক্ষিক জ্ঞান হইতে। এই আপেক্ষিক জ্ঞান আমাদিগকে এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু যখন আমরা অপরের মধ্যে আমাদেরই আত্মাকে দেখিতে পাইব তখন আমরা আমাদের নিজ আত্মাকে ঘৃণা না করিয়া কিরূপে অপরকে ঘৃণা করিতে পারি? আত্মা আত্মাকে ঘৃণা করিবে ইহা কি সম্ভবপর? আমাদের নিজ আত্মাকে ঘৃণা করা যেরূপ অসম্ভব, অপরের আত্মাকে ঘৃণা করাও সেইরূপই অসম্ভব। আত্মজ্ঞানজনিত বিভিন্ন ফলের মধ্যে ইহাই একটি ফল। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় ঘৃণার ভাব একেবারেই থাকিতে পারে না। যখন ঘৃণা চলিয়া যাইবে তখন হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি স্বার্থজনিত কুপ্রবৃত্তিগুলিও দূর হইয়া যাইবে। তখন কি অবশিষ্ট থাকিবে? আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে ঘৃণার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ স্বার্থজড়িত সর্ব্বজনসুলভ মানবীয় ভালবাসাও অন্তর্হিত হইবে; এবং তাহার পরিবর্ত্তে আত্মজ্ঞানীর হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ভগবৎ প্রেম ও সর্ব্বজীবে ভালবাসা স্ফুরিত হইবে। যথার্থ প্রেম একত্বভাবপ্রকাশক। যেমন দেহের উপর ভালবাসার জন্য আমরা দেহকে আত্মার সহিত অভিন্ন বোধ করি সেইরূপ পরমাত্মার উপর ভালবাসার জন্য আমরা নিজেকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বোধ করিয়া থাকি এবং যদি সেই পরমাত্মাকে আমরা অপরের আত্মার মধ্যে দর্শন করি তাহা

হইলে তাঁহাকেও নিজ আত্মার ন্যায় ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিব না। এইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আমরা "তোমাকে তুমি যেমন ভালবাস, সেইরূপ তোমার প্রতিবেশীকেও ভালবাসিও"—যীশুখৃষ্টের এই উপদেশের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব। যীশুখৃষ্টের এই উপদেশ যে, একেবারে অনন্যসাধারণ তাহা নহে। বেদান্ত অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সত্য শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকাবাসী খৃষ্টানগণ বলেন যে, যীশুখৃষ্টই কেবল এইরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ঐ সত্যই বেদান্ত ধর্ম্মনীতির মূল ভিত্তিস্বরূপ।

কায়, মন ও বাক্যে একত্বভাব প্রকাশের নামই প্রেম। "যে সময় সর্ব্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক হইয়া যায় অর্থাৎ যখন আত্মার সহিত সকল ভূতকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করা যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর পক্ষে মোহই বা কি, শোকই বা কি? অর্থাৎ শোক, মোহ থাকে না।"*

আত্মজ্ঞান সর্ব্বভুতের সহিত একত্বানুভূতির সঞ্চার করে। যখন সর্ব্বভূতকেই এক বিরাট বিশ্বাত্মার অংশবিশেষ বলিয়া বোধ হয় তখন মোহও থাকে না, ভয়ও থাকে না, শোকও থাকে না; কারণ, আত্মা ব্যতিরেকে এমন কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না যাঁহার জন্য শোক করিতে হইবে, বা যাহার জন্য দুঃখভোগ করিতে হইবে। যতক্ষণ দ্বৈতজ্ঞান বা বহুত্বজ্ঞান থাকে, তত-

---

* যস্মিন সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭॥—ঈশোপনিষৎ ॥

ক্ষণ শোক, দুঃখ, ভয় ইত্যাদির উদয় হয়। যদি ভয়োৎ-পাদক বা দুঃখোৎপাদক বিষয়গুলি সেই সর্ব্বানুস্যূত বিমল পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায় তাহা হইলে শোক ও ভয় দুইটিরই লোপ হইবে। কিন্তু যতক্ষণ আত্মার বাহিরে অন্য কোন বস্তু বা বিষয় আছে এই প্রকার জ্ঞান আমাদের থাকিবে ততক্ষণ শোক বা দুঃখ বা ভয়ের কবল হইতে আমাদের কোন পরিত্রাণ নাই। কিন্তু এক অদ্বিতীয় আত্মার জ্ঞান লাভ হইলে শোক, দুঃখ, ভয়, মোহ ও বিচ্ছেদ সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহাই আত্মজ্ঞানের অন্যতম ফল।

কেহ কেহ মনে করেন যে, বেদান্ত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে শিক্ষা দেন। ইহা একেবারেই সত্য নহে। বেদান্ত-মতে আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' জ্ঞানটির বিনাশ হয় এবং এই ক্ষুদ্র 'অহং' বা 'দেহাত্ম' বুদ্ধির লোপের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার-প্রসূত স্বার্থপরতা দূরীভূত হইয়া যায়। বিরাট 'অহং' এবং 'ক্ষুদ্র অহং বা দেহাত্মবোধবিশিষ্ট অহং' এই দুইটির অর্থ এক নহে। 'বিরাট অহং' বলিলে পরমাত্মাকে বুঝায় এবং ঐ পরমাত্মাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বা আমাদের পবিত্র ঐশ্বরিক ভাব। আমাদের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ঐশ্বরিকভাবে পূর্ণ। সুতরাং "আত্মা" এই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ও ঐশ্বরিক ভাবকেই বলা হইতেছে, ইহাই আমরা মনে রাখিব। তাহা হইলে "আত্মার" কথা বলিলে আর জীবের স্বার্থপরতার গন্ধ আসিবে না।

এই আত্মা সম্বন্ধে ঈশোপনিষৎ আরও বলিতেছেন :—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবি র্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

"জ্যোতির্ম্ময়, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর রহিত, অক্ষত, স্নায়ু-কেন্দ্র অথবা মস্তিষ্ক দ্বারা অস্পৃষ্ট, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বর্জ্জিত, কবি (ভূত-ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান-দর্শী), মনীষী (মনের প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ), পরিভূ (সর্ব্বোপরি বিরাজমান), স্বয়ম্ভু (উৎপত্তি বা হেতু রহিত, স্বয়ং প্রকাশ) সেই পরমাত্মা সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং নিত্যকালের নিমিত্ত সর্ব্ববস্তু যথাযথ হেতু ফলরূপে প্রদান করিয়াছেন।" এই পরমাত্মা নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া ওত-প্রোত ভাবে সর্ব্ববস্তুর অন্তরে বাহিরে ব্যাপিয়া আছেন।

আমাদের মন যেখানে যাইবে, আত্মাও সেখানে যাইবে, অর্থাৎ আত্মা ছাড়া মন নাই। বুদ্ধিকে এই আত্মাই আলোক প্রদান করিতেছেন; এই আত্মা পবিত্র, মলিনতা রহিত এবং সর্ব্বপাপ রহিত। এইখানে আমরা খৃষ্টান্ মত হইতে বেদান্ত মতের পার্থক্য দেখিতে পাই। খৃষ্টানেরা বলেন যে, মানবের আত্মা জন্মাবধি পাপী; কিন্তু বেদান্ত বলেন যে, আমাদের আত্মা সর্ব্বপাপবর্জ্জিত। এই শিক্ষা আমরা বেদান্ত

হইতে লাভ করিয়া থাকি। এতদ্বারা ইহাই মনে করা উচিৎ নহে যে, বেদান্ত মানুষকে পাপকর্ম্ম করিতে উৎসাহ দিতেছেন। কিন্তু অপরপক্ষে ইহা মানুষকে শিক্ষা দিতেছেন যে, যে মুহূর্ত্তে আত্মজ্ঞান লাভ হইবে সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত কুপ্রবৃত্তি চলিয়া যাইবে এবং পাপকর্ম্ম হইতে বিরতি ঘটিবে।

আত্মা এই শরীরের মধ্যে আছেন বটে, কিন্তু ইহা অশরীরী। ইহার কোন আকার নাই অর্থাৎ ইহা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকারের আকার রহিত। জগতে যে সকল সূক্ষ্ম আকার আছে যাহা অতি ক্ষুদ্র এবং যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্ট হয় না—এই প্রকার সূক্ষ্ম আকারও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ ইহা সর্ব্বাকার বর্জ্জিত। কিন্তু এই আত্মাই আবার যে কোনও রূপ বা আকার ধারণ করিতে সক্ষম এবং সর্ব্বপ্রকার রূপই এই আত্মাতে বিদ্যমান।

এই আত্মা শরীরস্থ স্নায়ুকেন্দ্রের এবং মস্তিষ্কের যাবতীয় ক্রিয়ারও বহিঃপ্রদেশে বিরাজমান। জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরাজ্যস্থ শক্তিকেন্দ্র সমূহের স্পন্দনের ফলেই 'অহংজ্ঞান' বা 'আত্মচৈতন্য' উৎপন্ন হয়। কিন্তু বেদান্ত ইহাদের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, 'স্নায়বিক শক্তিকেন্দ্র সমূহ বা মস্তিষ্ক প্রসূত শক্তিরাশি এই আত্মাকে স্পর্শই করিতে পারে না'। দেহের পরিবর্ত্তনে এই আত্মার কোনও

পরিবর্ত্তন হয় না ; স্থূল দেহের বর্ণের বা আকৃতির বৈলক্ষণ্য বা ভাবান্তর ঘটিতে পারে, ঐ দেহ রোগগ্রস্ত হইতে পারে বা উহা বিকলাঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু ঐ রোগ বা অঙ্গহীনতা আত্মার কিছুই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবে না। সুতরাং আত্মজ্ঞান মনুষ্যকে স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য বা অপরাপর দেহাদি সংক্রান্ত দুঃখ, ব্যাধি হইতে মুক্ত করে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, ব্যাধি বা দেহ জনিত দুঃখ থাকে না।

"কবি" শব্দ কাব্যরচয়িতাকে বুঝায় ; কিন্তু ইহার অপর একটি অর্থ হইতেছে সর্ব্ববস্তু-দর্শনক্ষম ব্যক্তি বা এক কথায়—সর্ব্বদর্শী। আত্মাই এই নিখিল বিশ্বের মহান্ "কবি" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী তিনি "কবি" এবং তাঁহার কবিতা হইতেছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।—ভগবানের মহিমা, সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে হইলে তাঁহাকে "কবি" এবং বিশ্বরাজ্যটিকে তাঁহার রচিত 'কবিতা' বলিলেই সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশিত হয়। তাঁহাকে আবার সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ শিল্পী বলিয়াও অর্থ করা হইয়াছে—সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তকালে তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই অনন্ত আকাশে যে, আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদি দেখি, তাহা অসীম আকাশে সেই অনন্ত শক্তিমান শিল্পীর হস্তরচিত চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ভাল মন্দের উপরে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বাহিরে অবস্থান করেন। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে,

আত্মা ভাল এবং মন্দের উপরে কিরূপে সম্ভবে? আবার কেহ, কেহ বলেন যে, আত্মা কেবল ভাল; মন্দের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ভাল এবং মন্দ এই দুইটি আপেক্ষিক শব্দ। ভালর অস্তিত্ব মন্দের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আমরা একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে রাখিতে পারি না; যদি মন্দ শব্দটি জগতে না থাকে তাহা হইলে ভাল শব্দটিও থাকিবে না। একটিকে সরাইয়া ফেলিলে অপরটিও অন্তর্হিত হইবে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধেও এইরূপ; ইহারা পরস্পর আপেক্ষিক শব্দে আবদ্ধ। একটির অস্তিত্ব ভাবিলে অপরটির অস্তিত্বও ভাবিতে হয়। কিন্তু নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা আপেক্ষিক রাজ্যের বাহিরে বিরাজমান; সুতরাং ইহাকে ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

উপনিষৎ বলেন,—"এই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা বা অন্য কোনও জ্ঞাতা নাই।" এই নিখিল বিশ্বের জ্ঞাতা কে হইতে পারেন? একমাত্র শাশ্বত সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞাতারূপে আছেন, যিনি সমস্ত বস্তু জানেন, এবং আমাদের অন্তরে যিনি জ্ঞাতারূপে বিরাজমান তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অংশ বা প্রতীক মাত্র। জগতের অধিকাংশ লোকই এই পরম সত্য অবগত নহেন। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা ইহা শিক্ষা দেন না, কারণ তাঁহারা নিজেরা এই সত্য বুঝিতে পারেন না যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্বভূতের জ্ঞাতা হ'ন তাহা

হইলে আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞাতা সেই বিরাট জ্ঞাতার অংশ মাত্র। বেদান্ত শিক্ষা দেন যে, প্রথমে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞাতাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্ব্বজ্ঞ বিরাট পুরুষ আমাদের অন্তরে উদিত হইবেন।

আমাদের পরমার্থস্বরূপ আত্মা কখনই জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় নহেন—তিনি সকল সময়েই বিষয়ী বা জ্ঞাতা। লোকে যে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সেই ঈশ্বরই সকলের অন্তর্যামী বিরাট জ্ঞাতা পুরুষ। সুতরাং বেদান্তের শিক্ষায় আমরা ঈশ্বরকে আমাদের আত্মার অতি সন্নিকটে দেখিতে পাই ; কিন্তু খৃষ্টান্ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর বহু দূরে অবস্থিতি করেন। তাঁহাকে এতদূরে স্থান দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার নৈকট্য লাভ করা জীবের পক্ষে দুরাশা মাত্র। বেদান্ত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যাহা কিছু আছে, তাহা অপেক্ষাও সন্নিকটে ঈশ্বরকে আনিয়া দিয়াছেন। যদিও এই আত্মা 'পরিভূ' সর্ব্বব্যাপী, তথাপি তিনি প্রকৃতির বাহিরে সর্ব্বাতীত। ইহা সর্ব্বভূতে অবস্থান করিলেও কখন কোন জড় পদাথ নহেন। জড়-জগতের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা সমূহ ইহাকে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। এই পরমাত্মা প্রকৃতির বিকার সকলকে অতিক্রম করিলেও প্রকৃতির প্রত্যেক পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ইনি 'স্বয়ম্ভূ' অর্থাৎ ইহার কোনও কারণ নাই এবং কোন কার্য্যও নাই। পরমাত্মা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অতীত।

তথায় কার্য্য ও কারণে কোনও ভেদ নাই। পরমাত্মার কোনও কারণ না থাকিলেও ইহা সকল কারণের কারণ-স্বরূপ। মোট কথা এই যে, পরমাত্মা কার্য্য-কারণ নিয়মের অধীন নহেন। পরমাত্মা অনাদিকাল হইতে স্বয়ম্ভু অবস্থায় বিরাজ-মান আছেন এবং ভবিষ্যতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত এইরূপই থাকিবেন। ইহার আরম্ভ ও শেষ কেহ দেখিতে পারে না; —কারণ, আরম্ভ ও শেষ কালের অধীন এবং ইহা বিচার করিয়া অনুসন্ধান করাও মনোরাজ্যের ব্যাপার; কিন্তু উহাও কালের অধীন। আমরা অবশ্য এই বাহ্য জগতের আরম্ভ ও শেষ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে পারি, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহা চলে না; কারণ, আত্মা দেশ, কাল, নিমিত্ত, চিন্তা, মনন প্রভৃতির অতীত। সুতরাং ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই।

আত্মা সর্ব্বজ্ঞ। যে জ্ঞান আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ সেই জ্ঞানেরই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশককে আপেক্ষিক জ্ঞান বলা যায়। সাধারণতঃ লোকে ঈশ্বরকে যে সকল গুণে ভূষিত করে যথা—তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত ও নিত্য সেই সকল গুণগুলি আত্মার প্রকৃত স্বরূপের গুণ—এই কথা বেদান্ত বলিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বরের পরমার্থ স্বরূপ এবং আত্মার পরমার্থ স্বরূপ উভয়ই সমতুল্য। যাঁহারা এই আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি না করেন তাঁহারা অজ্ঞানান্ধকারে বাস করেন এবং তৎপ্রযুক্ত যাবতীয় দুখঃকষ্ট ভোগ করেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভীতচিত্ত

ও অসুখী অবস্থায় থাকেন। তাঁহারা এই পার্থিব জীবন-ধারণের প্রতিকুল সমস্ত অন্তরায়গুলিকে এবং দেহের মৃত্যুকে ভয় করেন। তাঁহারা দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ জড় দেহে এরূপ দৃঢ়ভাবে আসক্ত হইয়া থাকেন যে, উহা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিজ জীবনটিকে দুঃখময় করিয়া তুলেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ এবং পার্থিব ভোগবিলাস ভালবাসেন এবং যখনই উহাদের অভাব হয় তখনই মিয়ম্রাণ ও হাতাশ হইয়া পড়েন। তাঁহাদের বিবেচনায় এই পার্থিব জীবনে উপরি উক্ত সুখভোগ ভিন্ন অন্য কোনও উচ্চতর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। এবম্প্রকার ব্যক্তিগণের জীবন নিরবচ্ছিন্ন ভয় ও অশান্তিপূর্ণ ই হইয়া থাকে। যাঁহারা বিত্তশালী, তাঁহাদের চিত্তে ধনসম্পত্তি নাশের ভয় বর্ত্তমান; যাঁহাদের সুনাম ও উচ্চপদ আছে, তাঁহাদের ঐ সকল নাশের ভয় আছে; আর সাধারণ লোকের জরা, রোগ ও মৃত্যুভয়জনিত দুঃখভোগ ত আছেই। বাস্তবিক এই শ্রেণীর লোক কি কখনও এই জগতে প্রকৃত সুখ ও যথার্থ শান্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন? কখনই না। যাঁহারা ভয়মুক্ত হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই সুখী। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই ভয়কে জয় করা যায় এবং হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ আইসে। * সুতরাং যাহাতে এই জীবনেই আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি তাহার আমাদের সম্যক্‌রূপে যত্নবান হওয়া উচিত। আত্মজ্ঞানের

* "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"—উপনিষদ্।

আলোক আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে ও তৎসঙ্গে অজ্ঞান জনিত ভয়, শোক, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এমন কি পরাধীনতা, অসম্পূর্ণতা ও মোহাদি হইতে আমাদিগকে মুক্ত করে।

আমাদের 'স্বার্থপরতা,' অজ্ঞান (অবিদ্যা) হইতেই প্রসূত। এই অজ্ঞানই আমাদের ঐশীভাবকে বা আত্মাকে আবরণ-শক্তিদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে এবং বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা জড় দেহই যে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ এই মিথ্যা জ্ঞান জাগাইয়া দেয়। এই অবিদ্যার অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যাই এবং আমরা আমাদিগকে মরণশীল মানবের পুত্র বা কন্যা ইত্যাদি ভাবিয়া থাকি। এই প্রকারে আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ি এবং 'আমি, আমার'—ইত্যাকার স্বার্থপরতা পাশে আবদ্ধ হইয়া যাই। আত্মজ্ঞান অবিদ্যা নাশ করে এবং সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবের উদয় করে। তিনিই ধন্য যাঁহার চিত্ত অজ্ঞানরূপ অমানিশার ভয় এবং স্বার্থপরতারূপ কৃষ্ণ মেঘ মুক্ত হইয়া জ্ঞান-সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখুন এই জগৎটা কি? ইহা অজ্ঞান-প্রসূত ও ভীতিসমাচ্ছন্ন। আত্মজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার সাংসারিকভাব বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে এবং ঈশ্বর যেরূপ ভয়শূন্য আমাদিগকেও সেইরূপ ভয়শূন্য করে। ঈশ্বর কি কোনও কিছুকে ভয় করেন? কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে? যে মুহূর্ত্তে আমাদের অনুভূতি হইবে যে, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে

অবস্থান করিতেছেন, সেই মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত ভয় অন্তর্হিত হইবে। যখন আমরা জানিতে পারিব যে, মৃত্যু দেহের ভাবান্তর মাত্র অর্থাৎ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ ভিন্ন মৃত্যু আর কিছুই নহে এবং যখন ইহাও জানিব যে, আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মা অপরিবর্ত্তনশীল, তখন আর আমাদের মৃত্যুভয় কি করিয়া থাকিবে? যাহাদের আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই তাহারা অতি হতভাগ্য। যে পর্য্যন্ত না তাহারা তাহাদের যথার্থ স্বরূপকে (আত্মা) উপলব্ধি করিতে পারিবে সে পর্য্যন্ত তাহাদের এই অজ্ঞানের সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

আত্মজ্ঞানই অনন্ত সুখের একমাত্র কারণ; ইহাই স্বাধীনতা ও মোক্ষের পথে লইয়া যায়। আপনি বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহেন বটে; কিন্তু যতক্ষণ আপনি মৃত্যুভয়ের দাস অথবা সাংসারিক অবস্থা-নিচয়ের দাস থাকিবেন, ততক্ষণ উহা কিরূপে লাভ করিতে পারিবেন? আপনি ঈশ্বরের অংশ—ইহাই চিন্তা করুন, ধ্যান করুন, উপলব্ধি করুন,' তাহা হইলে সমস্ত বন্ধনই খসিয়া পড়িবে এবং আপনি মুক্ত হইবেন। আত্মজ্ঞানের দ্বারা এই প্রকার মোক্ষ লাভ হইলেই আপনার 'অহং ব্রহ্ম' বা 'সোঽহং' ভাব বা ঈশ্বরের সহিত একত্বানুভূতি আসিবে। তখনই আপনি বলিতে সক্ষম হইবেন * "সূর্য্যের মধ্যে যে জ্যোতিঃ দেখিতেছি তাহা আমার মধ্যেও আছে

* যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" ১৬।—ঈশোপনিষৎ

এবং আমার মধ্যে যে জ্যোতিঃ রহিয়াছে তাহাই সূর্য্যের মধ্যেও রহিয়াছে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রভু আমি এবং জাগতিক বাহ্যবস্তুরও প্রভু আমি"।

"আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আলোক স্বরূপ; আমারই আলোকে শশী, সূর্য্য, নক্ষত্র ও বিদ্যুৎ প্রকাশমান। আমি আমার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি; নিখিল বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ কি তাহাও আমি উপলব্ধি করিয়াছি; সুতরাং আমি সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বিরাট পুরুষের সহিত এক হইয়া গিয়াছি।"

"বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিত-মাবিরাবির্ম যোঽভূর্বেদসা মৎসাঽণীর্শ্বতং মা মা হিংসী-রনেনাধীতেনাহোরাত্রাৎ সংবসাম্যগ্ন ইড়া নম ইড়া নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বোঽস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃড়ীকা সরস্বতী মা তে ব্যোম সাদৃশি। অদধ্বং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ।" ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। —কৌষীতক্যুপনিষৎ।

"হে বাগ্‌দেবী! আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি মূর্ত্তিমতী জ্ঞানরূপিণী-রূপে আবির্ভূতা। আমার নিকট হইতে তুমি শব্দস্বরূপে দিগ্ব্যাপিনী হইয়াছ; অতএব সত্য নষ্ট করিও না। বর্ত্তমান অধ্যয়নেই যেন দিন রাত্রি একই ভাবে অবস্থান করিতে পারি। হে অগ্নে! তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার। মন্ত্রপ্রয়োজক ঋষিগণকে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার। মন্ত্রপতি দেবগণ! তোমাদিগকেও নমস্কার। সরস্বতী আমাদিগের প্রতি বিশুদ্ধা কল্যাণময়ী এবং সুখদায়িনী হউন। আমি যেন শূন্যময় না দেখি। সূর্য্য যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কখনও ইহার অন্যথা হয় না, সেইরূপ আমাদের মন নির্ম্মল এবং চক্ষুঃ ইষ্টদর্শী হউক। ইহার অন্যথা করিও না।"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রাণ ও আত্মা

যীশুখৃষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, সেই বৈদিক যুগের সময় হইতে ভারতবর্ষে আত্মজ্ঞানের চর্চ্চা কেবল যে, দার্শনিক পণ্ডিতগণের বা ঋষিদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তৎকালীন রাজন্যবর্গও আত্মজ্ঞান লাভকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতেন। প্রাচীন ভারতে অধিকাংশ ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ না হইয়াও আধ্যাত্মিক বিষয়ে হিন্দুদিগের গুরু ছিলেন। সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, পুরাকালে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণ আধ্যাত্মিক সত্য শিক্ষা দিতেন এবং রাজ্যশাসনাদি ও যুদ্ধাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়গণেরই কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেনাপতি হইয়াছিলেন, এবং সংগ্রামের সময় তাঁহারা যথেষ্ট শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই কখনও দেশের রাজা বা সম্রাট হইতেন না। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রসিদ্ধ সেনাপতি হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধও করিয়াছিলেন। ইঁহারাই আবার তৎকালীন ক্ষত্রিয়গণকে ধনুর্ব্বিদ্যা, অস্ত্র-বিদ্যাদি শিক্ষা

দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে উপনিষৎ এবং পুরাণ সমূহে বর্ণিত আছে যে, ক্ষত্রিয়গণই প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের গুরু ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র এবং বুদ্ধ—ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধব্যবসায়ী জাতি বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় তাঁহারা দেশ রক্ষা করিতে, রাজ্যশাসন করিতে, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে এবং রাজ্যে শান্তি, সুবিচার ও ধর্ম্ম স্থাপন করিতে বাধ্য ছিলেন। যদিও এই সকল কার্য্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ছিল, তথাপি তাঁহারা প্রকৃত স্পৃহাযুক্ত অনুসন্ধিৎসু-গণকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেও অধিকারী ছিলেন।

প্রাচীনকালে হিন্দুশাসনকর্ত্তাগণ আধুনিক রাজাদিগের মত ছিলেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, মানব জীবনের একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে; যতদিন উহা উপলব্ধি করিতে না পারা যায়, ততদিন জীবনের সার্থকতা পূর্ণ হয় না। এমন কি, সেই প্রাচীন যুগেও সত্যানুসন্ধিৎসু রাজাগণ ভাবিতেন যে, যাহারা 'আমি কে, এবং আমার স্বরূপই বা কি,' এই তত্ত্বের মীমাংসা না করিয়া জীবন যাপন করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে পড়িয়া আছে। এই সমস্ত কারণে তাঁহারা ক্ষাত্রধর্ম্ম বিহিত রাজ্যশাসন কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়াও আত্মজ্ঞান সাধনার জন্য যথেষ্ট সময় পাইতেন।

পুরাকালে এই ভারতবর্ষে বারাণসী নগরীতে দিবোদাস

নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বারাণসী তখন পাশ্চাত্য জগতের এথেন্স * নগরীর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা-শিক্ষার স্থান ও ধর্ম্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শন-শাস্ত্র চর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বারাণসী প্রাচ্য সভ্যতার উৎপত্তিস্থান বলিয়া পরিগণিত। যীশুখৃষ্ট জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময়ও এই স্থান হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রধান দুর্গ ও অনুশীলনক্ষেত্র ছিল—বুদ্ধদেব যদি এই বারাণসীর পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া নিজ পক্ষ অবলম্বন করাইতে না পারিতেন তাহা হইলে সমগ্র ভারতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার ও নিজ মত স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন না।

বারাণসীরাজ দিবোদাসের প্রতর্দ্দন নামক এক শৌর্য্যবীর্য্য-শালী পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি দেবতাগণকেও যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। রাজকুমার প্রতর্দ্দন অসীম সাহস ও অলোক-সামান্য ক্ষমতা বলে পৃথিবীর সমস্ত পরাক্রান্ত নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাগণকে জয় করিবার মানসে দেবলোকে উপস্থিত হইলেন। কৌষীতকী উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই অভিযানের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের মতে বজ্রধারী ইন্দ্রদেব বহু যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা দেবতাদিগের অধিপতি

* ইউরোপস্থ গ্রীস্ দেশের রাজধানী ছিল।

হইয়াছিলেন। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন অন্যান্য দেবতা-দিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। তিনি কিরূপে প্রবল শত্রুগণকে নিপাত করিয়াছিলেন এবং দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া-ছিলেন, তাহা দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট বর্ণনা করিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং কি প্রকারে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও বিজয়ের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন, "আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; আমি তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করি। তোমার যাহা অভিলাষ তাহা প্রার্থনা কর, আমি তাহা পূরণ করিব।" রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "যাহা লোকের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর সেইরূপ বর আপনিই বিবেচনা করিয়া আমায় প্রদান করুন।" লোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ঈপ্সিত বস্তু কি তাহা তিনি জানিতেন না, কিন্তু ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহা দ্বারা সকলেই উপকৃত হইবে। যে সকল লোক মায়া-মোহে অভিভূত হইয়া, নিজ স্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধকারে বাস করিতেছে, তাহাদের এইরূপ কিছু প্রয়োজন, যাহা দ্বারা তাহারা জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করিতে সক্ষম হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতর্দ্দন বলিলেন, "মনুষ্যের

পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া আপনি মনে করেন তাহাই আমায় দান করুন।” ইন্দ্র উত্তর করিলেন, “উহা ঠিক নহে; তোমার অভিপ্রেত বর তুমি নিজে প্রার্থনা কর; নিজের অভিপ্রেত বস্তুকে অপরে তাহার হইয়া কি প্রকারে বাছিয়া দিবে?” রাজপুত্র নিরুৎসাহ না হইয়া আবার বলিলেন, “আমি আপনার নিকট আমার নিজের জন্য বর প্রার্থনা করিতে চাহি না। মনুষ্যের পক্ষে কি শ্রেয়স্কর বস্তু হইতে পারে, তাহার ধারণা না থাকায় তিনি কিছুই প্রার্থনা করিতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি সমস্ত ভার ইন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, “আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ এবং আমার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হইবে না; সেই জন্য আমি তোমাকে এইরূপ বর প্রদান করিব যাহা অপেক্ষা মনুষ্য জাতির অন্য কোনও শুভকর ও আবশ্যকীয় বস্তু হইতে পারে না।

“সহোবাচ মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহং
মনুষ্যায় হিততমং মন্যে।” ১।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন,—‘আমাকে’ জান; ‘আমার স্বরূপ’কে বিদিত হওয়াই মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর —ইহা আমি মনে করি।”

দেবরাজ ইন্দ্র যে বলিলেন, “আমাকে বিদিত হও” ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, “আমার (ইন্দ্রের) শক্তি, আমার যশ বিদিত হও।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ‘আমি, আমাকে,

আমার' বা 'তুমি, তোমাকে, তোমার' এই শব্দগুলির দ্বারা যাহাকে নির্দ্দেশিত করা হয়, সেই প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মাকে বিদিত হও। যিনি এই স্বরূপকে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি অসীম ক্ষমতা লাভ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি যদি কায়িক কোনও অন্যায় কার্য্য করেন, তাহা হইলে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী—সামান্য রাজা হইতে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটও তাঁহার নিকট কিছুই নহে। তিনি শাস্ত্রোল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণের অধিকারী হন এবং কিছুতেই তাঁহার আত্মজ্ঞানলব্ধ মহিমা ম্লান হয় না।

পরে ইন্দ্র সর্ব্বপাপধ্বংসকারক আত্মজ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করিবার জন্য বলিলেন, "আমি সমস্ত দৈত্যগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছি।" "আমি ত্রিশীর্ষ দৈত্যকে ও ত্বষ্ট্রতনয় বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছি; যে সকল যতী মুখে বেদোচ্চারণ করে না তাহাদিগকে বন্য কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি; স্বর্গে প্রহ্লাদ-পক্ষীয় অসুরদিগকে, ভুবর্লোকে পুলোম-সম্বন্ধীয় অসুরগণকে এবং পৃথিবীতে কালখঞ্জ-পক্ষীয় অসুরসমূহকে বিনাশ করিয়াছি। আমি এইরূপ অনেক নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়াছি কিন্তু আমার আত্মজ্ঞান আছে বলিয়া এই সমস্ত ভয়ঙ্কর কার্য্য করিলেও আমার যশ, শক্তি, ও ক্ষমতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই—এমন কি আমার একটি কেশেরও কোনও ক্ষতি হয় নাই।"

"যে ব্যক্তি আমার স্বরূপ জানেন, তিনি জীবনে যতই পাপকার্য্য করুন না কেন—চৌর্য্য, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা অথবা বেদপাঠনিরত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণহত্যা প্রভৃতি পাপকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সুকৃত ফল বিনষ্ট হয় না। সেই ব্যক্তি কোন পাপকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহার মুখকান্তি কখন ম্লান হয় না"* এইরূপে ইন্দ্র আত্মজ্ঞানের কি মহিমা তাহা বর্ণনা করিলেন।

এই প্রকার বর্ণনা দ্বারা ইন্দ্র ইহা বুঝাইতে চাহেন নাই যে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে বলীয়ান্ হইয়া কখনও এইরূপ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক পাপকর্ম্ম সকল করিবেন; কিন্তু উক্ত প্রকার বর্ণনা দ্বারা দেবরাজ ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, আত্মজ্ঞানের শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ তাঁহার উক্তি হইতে এই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মহাপাপীরও হৃদয় নির্ম্মল করে এবং মনুষ্যের অতি ভয়ানক মহাপাপও ইহা দ্বারা ধৌত হইয়া যায়। পিতৃমাতৃহত্যাকারী বা গুরু-হত্যাকারীর পাপ যাহা কখনই ক্ষমার্হ বলিয়া মনে হয় না তাহাও আত্মজ্ঞানলব্ধ ও চিত্তশুদ্ধিক্ষম পবিত্র শক্তিকে মলিন করিতে পারে না।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া

*"স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে।
ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া নাস্য
পাপং চন চকৃষো মুখান্নীলং বেত্তীতি।—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।১ অধ্যায়।

বলিলেন, "আমিই জীবনীশক্তি প্রাণ; এবং আমিই প্রজ্ঞাত্মা। আমাকে আয়ুঃ অর্থাৎ প্রাণিগণের জীবন-কারণ এবং অমৃত-স্বরূপ জানিয়া আমার উপাসনা কর। আয়ুঃই প্রাণ এবং প্রাণই আয়ুঃ, প্রাণই অমৃত।" *

সংস্কৃত ভাষায় জীবনীশক্তিকে 'প্রাণ' বলে; প্রাণ এবং চৈতন্য অবিভাজ্য; যেখানেই প্রাণ আছে সেখানেই চৈতন্য কোন না কোনও আকারে থাকিবেই। ইন্দ্র আবার বলিলেন, "প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে আমারই রূপ মনে করিয়া ধ্যান কর। জীবনই প্রাণ এবং প্রাণই জীবন; জীবনই অমরত্ব এবং অমরত্বই জীবন।" এই স্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জীবন বা প্রাণের কখনও মৃত্যু নাই। প্রাণ অবিনশ্বর ও অবিনাশী, ইহার কোনও পরিবর্তন হইতে পারে না। প্রাণকে আমরা অল্পপ্রাণ হইতে বৃহত্তর প্রাণে বর্দ্ধিত হইতে দেখি না।

বাহ্যজগতে স্থূলভাবে প্রকাশমান হউক বা না হউক, প্রাণ সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বসময়ে একই প্রকার থাকে। ইহার স্থূলবিকাশ বিভিন্নপ্রকারে হইতে পারে, কিন্তু জীবনী-শক্তি বলিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং সর্ব্বদা সমভাবেই বর্ত্তমান। স্থূলদেহে জীবনীশক্তি-বিকাশের অভাবকেই আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক প্রাণ

---

* "সহোবাচ, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা; তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব। আয়ুঃ প্রাণঃ। প্রাণো বা আয়ুঃ। প্রাণ এবামৃতম্।"

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ২।৩ অধ্যায়।

বা জীবনীশক্তির মৃত্যু নাই। অল্পসংখ্যক লোকই ইহা ধারণা করিতে পারেন। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে 'মৃত্যু' থাকিতে পারে না। আমরা বলিয়া থাকি যে, একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সে দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু ঐ শিশুটির প্রাণ বা জীবনী-শক্তি কি বৰ্দ্ধিত হয়? যদি জীবনী-শক্তি বা প্রাণ জন্ম ও বৃদ্ধির অধীন হইত তাহা হইলে উহা পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর হইত। যাহাকে আমরা জীবনী-শক্তি বা প্রাণ বলিয়া থাকি তাহা জন্ম, ক্ষয় ও মৃত্যু হইতে মুক্ত। আমরা স্থূল আকারের পরিবর্ত্তন হইতে দেখি, কিন্তু ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তনের সহিত অমর প্রাণ বা জীবনী-শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না—উহার অর্থ এই যে, জীবনী-শক্তির লীলা যে সমস্ত আধারের মধ্য দিয়া ঘটিয়া থাকে সেই সমস্ত আধারেরই হ্রাস বা বৃদ্ধিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমরা বলি যে, একটি শিশু বা একটি চারাগাছ ক্রমে ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইতেছে—যাহা কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা উহাদের স্থূল আকারের মধ্যেই ঘটিতেছে; উহাদের মধ্যে যে জীবনী-শক্তি বা প্রাণ আছে তাহা জন্ম হইতেই সমভাবে বর্ত্তমান আছে। প্রাণ অন্যান্য ভৌতিক শক্তির বিকাশের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় প্রাণীজগতের বা উদ্ভিদ্ জগতের ক্রমবিকাশ বা ক্রমবর্দ্ধনের বিভিন্নাবস্থায় উহা ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

"যাহা প্রাণ তাহাই জীবন এবং যাহা জীবন তাহা

অমর। যতক্ষণ দেহের মধ্যে প্রাণ আছে ততক্ষণ উহার জীবনও (life—আয়ুঃ) আছে। এই প্রাণের সাহায্যেই স্বর্গাদি লোকে অমরত্ব লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া প্রাণই অমৃত।* যদি আমরা প্রাণের বা জীবনের স্বরূপ জানিতে পারি এবং যদি আমরা প্রাণের সহিত জীবন যে, অবিভাজ্যরূপে সংস্পৃষ্ট এই ভাবটি অনুভব করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের যে, মৃত্যু নাই এই সত্য নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে। কারণ প্রাণ বা জীবনের মৃত্যু নাই ও প্রাণহীন কোন জড় পদার্থ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় নাই। যদি আমরা আমাদের কল্পনায় প্রাণের উৎপত্তি কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে প্রাণ যে, কোন প্রাণহীন পদার্থ বা মৃত পদার্থ হইতে আসিয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্তে কখনও উপনীত হইতে পারি না। প্রাণ উৎপন্ন হয় প্রাণ হইতেই। এই প্রাণ সেই অনাদিকাল হইতেই আছে এবং ইহার যে, কখনও মৃত্যু বা ধ্বংস হইতে পারে তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না; সুতরাং ইহা নিত্যপদার্থ। কিন্তু যখন এই প্রাণ কোনও স্থূল দেহের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় তখন দেহটিকে জীবিত বলিয়া অনুমান হয়—ইহাকেই প্রাণশক্তির গৌন বিকাশ বলিতে হয়। এখানে আমরা জীবনী-শক্তির বা প্রাণের বিষয় ভাবি না; কিন্তু প্রাণের

*"যাবৎ হি অস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ। প্রাণেন হ্যেবামুষ্মিঁল্লোকেঽমৃতত্বমাপ্নোতি।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ২।৩ অধ্যায়।

সাহায্যে যে দেহটি গতিশীল ও কার্য্যক্ষম তাহারই বিষয় ভাবিয়া থাকি।

যখন আমরা দেখি যে, কোনও একটি জীব বা প্রাণী নড়িতেছে বা কার্য্য করিতেছে তখন আমরা কারণরূপী প্রাণশক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া উক্ত জীব বা প্রাণীর কথাই মনে করিয়া থাকি; "অমুক ব্যক্তি এতদিন জীবিত ছিলেন বা অমুক ব্যক্তি তিনকুড়ি বা চারকুড়ি বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন"—এই সমস্ত উক্তির দ্বারা আমরা আয়ুঃ বা প্রাণের গৌন বিকাশ মাত্রেরই উল্লেখ করিয়া থাকি; মুখ্যভাবে প্রাণ অমর বা মৃত্যুহীন। যখন কোন শরীরে এই প্রাণের বা জীবনী-শক্তির অভিব্যক্তি হয় তখনই শরীরের যন্ত্রগুলি ক্রিয়াশীল হয়—ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ কার্য্য করে, মন চিন্তা করে এবং বুদ্ধিও কার্য্যকরী হয়।

আবার এই প্রাণ 'প্রজ্ঞা' হইতে অবিচ্ছেদ্য। যে শক্তি এই বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তুকে গতিশীল করে, সেই শক্তিকে আমরা 'প্রজ্ঞা' হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। আত্মার মধ্যে দুই প্রকার শক্তি নিহিত আছে—একটি চিৎ-শক্তি বা প্রজ্ঞারূপে প্রকাশ পায় এবং অপরটি জীবনী-শক্তি বা প্রাণের ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। যাহা দ্বারা কোনও বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই প্রজ্ঞা। ইহা চৈতন্য স্বরূপ। ইহাকে বিষয়জ্ঞান বলা যাইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির জ্ঞান কেবল বুদ্ধির ক্রিয়া মাত্র; এই ঐন্দ্রিয়িক

জ্ঞান যাহা দ্বারা উদ্ভূত হয় তাহাকেই 'প্রজ্ঞা' বলে। "প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পং।"—এই প্রজ্ঞা বা জ্ঞান-শক্তি দ্বারাই অভিলষিত সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাহার পর ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি আমাকে অবিনশ্বর, ধ্বংসাতীত এবং অপরিবর্ত্তনশীল প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপে জানে সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল এই পৃথিবীতে বাস করিয়া মৃত্যুর পরে স্বর্গধামে গমন করে এবং সেখানে অনন্ত জীবন (আয়ুঃ) উপভোগ করে।" * এই স্থানে ইন্দ্র জীবনী-শক্তির পরিবর্ত্তে 'প্রাণ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া রাজপুত্র প্রতর্দ্দন ভাবিলেন যে, ইন্দ্র বোধ হয় ইন্দ্রিয়শক্তি অর্থে 'প্রাণ' শব্দটি উল্লেখ করিতেছেন ; কারণ 'প্রাণ' শব্দটি—দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, মলমূত্রাদিত্যাগ-শক্তি, প্রজননশক্তি, আস্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি, বাক্‌শক্তি, ধারণশক্তি এবং দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদির শক্তি বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তজ্জন্য তিনি বলিলেন, "কেহ কেহ বলেন যে, সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি একীভূত হইয়া যায়, কারণ তাহা না হইলে একই সময়ে কেহ দর্শন, শ্রবণ, বাক্য উচ্চারণ, এবং চিন্তাও করিতে পারিবে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি এক হইয়া পরে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় পৃথক্‌ভাবে তাহার শক্তির পরিচয় দেয়।"† বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যাবলীকেই

---

* "স যো মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্তে সর্ব্বমায়ু রস্মিঁল্লোঁক এতি। অপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে।"—২।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

† "তত্রৈক আহুরেকভূয়ং বৈ প্রাণাঃ গচ্ছন্তীতি। নহি কশ্চন শক্নুয়াৎ

ইন্দ্র প্রাণেরই কার্য্য বলিতেছেন মনে করিয়া রাজপুত্র জানিতে চাহিলেন যে, তিনি কোন্ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে (রাজপুত্রকে) উপরি উক্ত উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য জীবনীশক্তি বা প্রাণ যে একই তাহা রাজপুত্র সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন; তথাপি তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ যুগপৎ কার্য্য না করিয়া পৃথক্‌ভাবে একটির পর একটি করিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।* দুইটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কখনও একই সময়ে হয় না—ঐ দুইটি অনুভূতির অন্তরালে সামান্য অবকাশ থাকিবেই থাকিবে। কখনও কখনও আমাদের মনে হয় যে, একই সময়ে একটি শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল ও একটি দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ দুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য একই সময়ে সম্পন্ন হয় নাই—ইহার সত্যতা যথাযথ বিশ্লেষণ বা বিচারের দ্বারা উপলব্ধি হইবে। বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি কখনও একই সময়ে এবং একই সঙ্গে হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে, মন ইন্দ্রিয়ানুভূতিযোগ্য বস্তুসকলকে

সকৃদ্বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দং মনসা ধ্যাতুমিত্যেকভূয়ং বৈ প্রাণাঃ।"—২।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

* "একৈকমেতানি সর্ব্বাণ্যেব প্রজ্ঞাপয়ন্তি। বাচং বদন্তীং সর্ব্বে প্রাণা অনুবদন্তি। চক্ষুঃ পশ্যৎ সর্ব্বে প্রাণা অনুপশ্যন্তি; শ্রোত্রং শৃন্বৎ সর্ব্বে প্রাণা অনুশৃন্বন্তি; মনো ধ্যায়ৎ সর্ব্বে প্রাণা অনুধ্যায়ন্তি। প্রাণং প্রাণন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনুপ্রাণন্তীতি।"—২।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

একটির পর একটি করিয়া গ্রহণ করে, অর্থাৎ মন উক্ত প্রকার একটি বস্তুতে যুক্ত হইবার পরে অপর একটি বস্তুতে যুক্ত হয়। যখন একটি ইন্দ্রিয় তাহার কার্য্যে রত হয় তখন অপর ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চেষ্ট বা শান্তভাবে তাহাকে অনুমোদন করে। দুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের মধ্যে ক্রমবিচ্ছেদ বা অবকাশ এত অল্প যে, যদিও আমরা মনোযোগ করিয়াও উহার বিষয় অবগত হইতে না পারি, তথাপি ইহা সত্য যে, ইন্দ্রিয়গুলি একটির পর একটি করিয়া পৃথক্‌ভাবে তাহাদের কার্য্য করিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত কারণে রাজপুত্র বুঝিতে পারেন নাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া কোন্ ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করিতেছিলেন। সুতরাং ঐ জটিল প্রশ্নটি করিয়া তিনি নীরবে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

ইন্দ্র বলিলেন, "ইহা সত্য বটে যে, ইন্দ্রিয়গুলি পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমূহ সম্পাদন করে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই শক্তিশালী; কিন্তু ইহা জানিও যে, এই ইন্দ্রিয়শক্তি-নিচয় ব্যতীত আর একটি জীবনীশক্তি বিরাজ করিতেছে যাহার তুলনায় অন্য কোন প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তি কিছুই নহে অর্থাৎ সকলপ্রকার শক্তি অপেক্ষা ঐ জীবনীশক্তি শ্রেষ্ঠ।"*

---

* "এবমু হৈতদিতি হেন্দ্র উবাচ, অস্তি ত্বেব প্রাণানাং
নিঃশ্রেয়সমিতি। জীবতি বাগপেতো, মূকান্ হি পশ্যামঃ,
জীবতি চক্ষুরপেতোঽন্ধান্ হি পশ্যামো
জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামঃ।"—২।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ

যে শক্তি আমাদের দর্শন করায় বা শ্রবণ করায় সেই শক্তি আমাদের জীবন ধারণে সাহায্য করে না। অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না, কিন্তু তথাপি তাহাদের জীবিত থাকিতে দেখা যায়। মূকের মধ্যে বাক্‌শক্তির অভাব, কিন্তু সেই মূকও বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ যে সকল ব্যক্তির ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদনশক্তি বা স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়াছে তাহা-দিগকেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়। শিশুরা এবং জন্মমূঢ় ব্যক্তিগণও চিন্তা করিবার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকে।* আবার ইহাও দেখা যায় যে, স্মৃতিশক্তির লোপ হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিও জীবিত থাকে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে শক্তি দ্বারা আমরা জীবিত থাকি সেই শক্তি এবং উপরি উক্ত দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-আস্বাদন-বাক্-চিন্তাশক্তি এক নহে। আবার কোনও ব্যক্তি হস্তবিহীন হইয়া কিছু ধরিতে সক্ষম না হইলেও আমরা তাহাকে মৃত নামে অভিহিত করিতে পারি না। এইরূপ যদি কাহারও চরণ বা অন্য কোনও অঙ্গ বিকল হয় তাহা হইলে বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য সেই ব্যক্তির জীবনী-শক্তি বা 'মুখ্য-প্রাণ' তিরোহিত হইবে না। সুতরাং এখন আমরা

---

* "জীবতি মনোপেতো বালান্ হি পশ্যামঃ ;
জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবতি উরুচ্ছিন্ন ইতি।
এবং হি পশ্যাম ইতি।"—২।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

বলিতে পারি যে, এই জীবনীশক্তি বা 'মুখ্য-প্রাণ' ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অথবা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আবার ইহাও সত্য যে, জীবনী-শক্তি বিচ্যুত হইলে দেহের বহির্যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি কোনও কার্য্যই করিতে পারে না।

জীবনী-শক্তি বা 'মুখ্য-প্রাণ' ইন্দ্রিয়শক্তির উপর নির্ভর-শীল নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি জীবনী-শক্তির উপর সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করে। যথায় জীবনীশক্তির বাহ্যবিকাশ না থাকে তথায় ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলি নিখুঁৎ থাকিলেও উহাদের ক্রিয়াসমূহ এবং দর্শন' শ্রবণাদি অনুভূতির কোনও অভিব্যক্তি দেখা যাইবে না। একটি মৃত ব্যক্তির চক্ষু অবিকৃত থাকিতে পারে, চক্ষুর স্নায়ুসমূহও ঠিক্ থাকিতে পারে, মস্তিষ্কস্থ ক্ষুদ্র কোষগুলিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে কিন্তু ঐ দেহের মধ্যে জীবনী-শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকায় ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলি নিশ্চেষ্ট থাকে—তাহারা নিজ নিজ ক্রিয়া করিতে অক্ষম হয় এবং কোন প্রকার অনুভূতি উৎপন্ন করিতে পারে না; সমস্ত ইন্দ্রিয় একেবারে প্রাণহীন অবস্থায় থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত ক্রিয়ার মূল এই 'মুখ্য-প্রাণ' ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলিতে বিদ্যমান থাকিলেই উহারা ক্রিয়াশীল হয়। কারণ 'মুখ্য-প্রাণ'ই ইন্দ্রিয়গুলির অধিপতি ও নিয়ামক। তজ্জন্য বেদ বলেন, "নিখিল বিশ্বের জীবনদাতা সেই জীবনী-শক্তি বা 'মুখ্য-প্রাণ'কে সকলেরই উপাসনা করা উচিত।" যদি কেহ জীবনী-শক্তি বা 'মুখ্য-প্রাণ' কি তাহা বুঝিতে পারেন তাহা

হইলে তিনি কি উপায়ে জীবিত আছেন বা এই বিশ্বজগৎ কিরূপে সজীব রহিয়াছে সেই রহস্য তিনি ভেদ করিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ, শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ এবং ক্রমবিকাশবাদিগণ সকলেই এই জীবনী-শক্তিটি কিরূপ তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? না; তাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত এই বিষয়ে সফলকাম হ'ন নাই। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা আণবিক আকর্ষণশক্তি; আর কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির সংমিশ্রণের ফল; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহাদের মধ্যে কি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহার মতটিই অভ্রান্ত সত্য? জীবনী-শক্তির মূল কোথায় এই বিষয় অন্বেষণ করিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? জীবনী-শক্তি যে, প্রকৃতি-রাজ্যের জড়শক্তিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র এই ধারণা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু জীবনী-শক্তির বা প্রাণের উৎস কোথায় তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয় লইয়া বহু বাদপ্রতিবাদ এবং গবেষণা করিয়াছেন; কিন্তু উহা পূর্ব্বে যেমন জটিল ছিল, এখনও উহাদের নিকট ঠিক্ সেই প্রকার জটিলই রহিয়া গিয়াছে—উহারা এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন নাই। যে মুহুর্ত্তে আমরা এই সমগ্র বিশ্বের

জীবনী-শক্তির ধারণা করিতে পারিব, সেই মুহূর্ত্তে সেই চৈতন্যময় ও জীবন্ত ঈশ্বরের ধারণাও আমাদের হইয়া যাইবে। কারণ বেদান্ত বলেন যে, যিনি ঈশ্বর-রূপে পূজিত হ'ন তাঁহার সত্ত্বা হইতে এই জীবনী-শক্তি বা 'প্রাণ' অভিন্ন।

ঈশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝিব? যিনি সমস্ত বস্তুকে সচেতন রাখেন এবং যাঁহার উপর ইন্দ্রিয়শক্তিসকল, বাহ্যিক ও আন্তরিক যাবতীয় ক্রিয়া ও দেহধর্ম্মাদি নির্ভর করে তিনিই ঈশ্বর। ইন্দ্র বলিলেন: * "এই দেহ প্রাণের দ্বারা সজীব হওয়াতেই উঠিতে পারে; এই প্রাণই সেই চেতনা-সংযুক্ত

---

* "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি। তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।"
—৩।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

যেহেতু প্রজ্ঞাস্বরূপ প্রাণই এই প্রত্যক্ষ শরীরকে 'ইহাই আমি' অথবা 'ইহা আমার' এইরূপ জ্ঞান করিয়া আসন শয্যাদি হইতে উত্থাপিত করান সেই জন্য তাঁহাকেই "উক্থ" (উত্থাপয়িতা) বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা; যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণোপাধিযুক্ত পরমাত্মা।

"সহি হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতস্তস্যৈষৈব দৃষ্টিঃ।"
—৩।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ সম্মিলিত হইয়া এই শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়াই শরীর হইতে নির্গত হন; এই প্রাণোপাধিযুক্ত পরমাত্মাকে এইরূপেই অবগত হইতে হয়।

'অহং'। যাহা 'প্রাণ,' তাহাই 'প্রজ্ঞা' এবং যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ ; এই দুইটিই দেহের মধ্যে এক সঙ্গে থাকে এবং এক সঙ্গে চলিয়া যায়।" যেখানে জীবন নাই সেখানে কি কেহ 'প্রজ্ঞা' দেখিয়াছেন ? উহা একেবারে অসম্ভব। যেখানে প্রজ্ঞা আছে, সেখানে নিশ্চয়ই জীবন আছে। জীবন বা প্রাণ এবং প্রজ্ঞা এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য। এ কথা বলিতে পারা যায় যে, বৃক্ষলতাদিতে প্রজ্ঞার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতে দেখা যায় না ; কিন্তু ঐ কারণেই যে উহাদের মধ্যে 'প্রজ্ঞা' নাই তাহা কিরূপে স্বীকার করা সঙ্গত হইবে ? মনুষ্যের মত বৃক্ষাদির মস্তিষ্ক নাই বলিয়াই কি উহাদের মধ্যে 'প্রজ্ঞা' নাই এই মত পোষণ করিতে হইবে ? মস্তিষ্কযুক্ত প্রাণীসমূহের যেরূপ প্রজ্ঞা আছে, উদ্ভিদের ঠিক্ সেইরূপ প্রজ্ঞা না থাকিতে পারে ; কিন্তু মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে বৃক্ষাদির মধ্যে 'প্রাণ' ও তদুপযুক্ত স্নায়ু আছে যাহার জন্য তাহাদের 'প্রজ্ঞা' বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যে সকল উদ্ভিদ্ স্পর্শমাত্রেই আকুঞ্চিত হয়, যেমন লজ্জাবতী লতা—তাহাদের যে অনুভব-শক্তি নাই তাহা কেমন করিয়া বলা যায় ? বিধাতা যে, তাঁহার মহিমা প্রচারের জন্য কেবল মনুষ্যকেই জীবন দান করিয়াছেন, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের এবম্প্রকার গোঁড়ামী-পূর্ণ বাক্য সকল অধুনা আর আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে না। এমন কি, 'আর্ণেষ্ট হেকেলের' ন্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সম্যক্‌রূপে এই ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক লতাগুল্মের মধ্যে আত্মা আছে, প্রত্যেক

ক্ষুদ্র জীবকোষের মধ্যে প্রাণ আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক কোষই সজীব ; এমন কি প্রত্যেক পরমাণুটির ভিতরও আত্মা আছে। আর যেখানে আত্মা আছে সেখানে অহং-জ্ঞানের মূল 'প্রজ্ঞা', চৈতন্যও আছে। কোনও ক্ষেত্রে ইহার প্রকাশ অল্পমাত্রায় থাকে, কোনও স্থলে ইহা সুক্ষ্মভাবে থাকে ; আবার কোথাও ইহা সুপ্তভাবে থাকিয়া বহিঃপ্রকাশের উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, ইহা স্থির নিশ্চয় যে, যেখানেই জীবন আছে সেখানেই চৈতন্যের (প্রজ্ঞার) কোন-না-কোন প্রকার অস্তিত্ব আছেই এবং যেখানেই প্রজ্ঞার চিহ্ন দেখা যায় সেইখানে প্রাণও আছে ইহা বুঝিতে হইবে।

আমরা প্রাণী-জগতে দেখিয়া থাকি যে, যখন 'প্রাণ' চলিয়া যায় তখন প্রজ্ঞাও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। এইরূপ যখন দেহ নির্জীব অবস্থায় (মূর্চ্ছাবস্থায় বা অচৈতন্যাবস্থায়) থাকে, তখন তাহার দেহ বা ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে জীবনী-শক্তির কোনও প্রকার বহিঃ প্রকাশের চিহ্ন থাকে না এবং এই সময়ে তাহার প্রজ্ঞাও অন্তর্হিত না হইয়া সুপ্তভাবেই থাকে। তাহার পর ইন্দ্র আবার বলিলেন, "যখন কেহ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে এবং কোনও প্রকার স্বপ্নাদি দর্শন করে না, তখন তাহার মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে—সেই সময় ঐ ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে।"* কখন কখনও আপনারা

* "এতদ্বিজ্ঞানম্, যত্রৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।"– ৩।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।—অর্থাৎ "যে অবস্থায়

দেখিয়াছেন যে, স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া মনে হয়, যেন এক অজ্ঞানের রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসা গেল; এইরূপ নিদ্রাবস্থায় আপনাদের ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াসমূহের ও দর্শন-শ্রবণ-আঘ্রাণ ইত্যাদি শক্তির কি হয় তাহা কি আপনারা জানেন? তাহারা তখন প্রাণের মধ্যে সুপ্তভাবে থাকে অর্থাৎ তাহারা ফিরিয়া যাইয়া জীবনী-শক্তির মধ্যে তখন আশ্রয় লয়।* যখন জীবনী-শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন অন্যান্য শক্তি-গুলিও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। গভীর নিদ্রাবস্থায় আমরা কথাও বলি না, দর্শনও করি না বা কোনও কিছুর আঘ্রাণও পাই না। যদি তখন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতি নিকটে কামানেরও শব্দ হয় তাহাও আমরা তখন শুনিতে পাই না এবং আমাদের মনও তখন কোনও বিষয়ে চিন্তা বা কল্পনা করে না। সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ তখন সুপ্তাবস্থায় থাকে এবং আমরা জাগরিত হইলেই উহারাও যেন সেই সঙ্গে বাহির হইয়া আইসে। উক্ত প্রকার নিদ্রিতাবস্থা হইতে জাগরণের

পুরুষ গাঢ় নিদ্রায় সুপ্ত হইয়া অন্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানশূন্য হন এবং কোন স্বপ্ন দর্শন করেন না—তখন সেই পুরুষের যাবতীয় শক্তি এই প্রাণেই একত্ব প্রাপ্ত হয়”—ইহাই প্রাণবিজ্ঞান।

* "তদৈনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি।"

—৩।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

প্রথম লক্ষণ দৈহিক ক্রিয়ার দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। স্বপ্নশূন্য নিদ্রাবস্থা বা সুষুপ্তি অবস্থায়, জীবনী-শক্তি দেহের কেন্দ্রস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয় না ; কারণ তৎসময়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন, পরিপাক-করণ, পাকস্থলির ক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসাদির ব্যাপারে বুঝিতে পারা যায় যে, আন্তর্জ্ঞানিক (sub-conscious) প্রাণ-শক্তি আমাদের অচেতন অবস্থাতেও এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। যে শক্তির দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া চলিতে থাকে সেই প্রাণ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইলে শরীরের কোন ক্রিয়াই থাকে না। এইরূপে, সমস্ত যন্ত্র হইতে 'প্রাণ' বিচ্ছিন্ন হইলে কেহই আর জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আইসে না। ইহাকেই মৃত্যু কহে। কিন্তু গভীর নিদ্রাবস্থায় আমরা প্রাণের সহিত এক হইয়া যাই—তখন এই 'প্রাণ' আমাদের জ্ঞানযুক্ত দৈহিক ক্রিয়াসমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং জাগ্রতাবস্থায় ঐগুলি নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ফিরিয়া আইসে ; তখনই ইন্দ্রিয়-গুলি সচেতন হয় ও কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

উপরি উক্ত তথ্যটি বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ইন্দ্র বলিলেন, * "যখন প্রাণোপাধিক পুরুষ সুষুপ্ত অবস্থা হইতে ফিরিয়া জাগ্রত অবস্থায় আইসে তখন

---

* "স যদা প্রতিবুধ্যতে। যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বি-প্রতিষ্ঠেরন্ এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।"—৩।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি সমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্ফুলিঙ্গের মত নির্গত হইয়া নিজ নিজ স্থান—জিহ্বাদি প্রাপ্ত হয় এবং পরে বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আইসে।" যখন এইরূপ একটি প্রাণকণা চক্ষুকে আশ্রয় করে তখন উহা দৃশ্য বস্তুটিকে, তাহার আকারকে ও বর্ণকে উদ্ভাসিত করে। এইরূপে অপর একটি প্রাণকণা শ্রবণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিলে শব্দ শ্রবণ হয়। এই প্রকারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়শক্তিসকল প্রাণরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র কণারূপে নির্গত হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়াভিমুখে যাইতে থাকে। মনও এইরূপ একটি প্রাণ-কণা মাত্র—উহার দ্বারা চিন্তা প্রভৃতি নানাবিধ মানসিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু "যখন কেহ রোগ, শোক, জরা প্রভৃতির বশীভূত হইয়া দুর্ব্বলতাবশতঃ হস্তপদাদি অত্যন্ত অবশ হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি তাহাদের মূলদেশে (প্রাণে) প্রত্যাগত হয়; তখন সকলে বলে যে, লোকটির মন দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে। ঐ সময়ে আর সে দেখিতে, শুনিতে, কথা বলিতে, আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে বা চিন্তা করিতে পারে না। সেই ব্যক্তি তৎকালে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়।" * দেহ ত্যাগ করিবার

---

* 'যত্রৈতৎ পুরুষ আর্ত্তো মরিষ্যন্ আবল্যং ন্যেত্য সংমোহং ন্যেতি তদাহুঃ উদক্রমীচ্চিত্তম্। ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন ধ্যায়ত্য-থাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।"—৩৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

সময় 'প্রাণ' ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে সঙ্গে লইয়া যায়। মরণাপন্নব্যক্তির মহাপ্রস্থানের সময় দেহী বা জীবাত্মা উহার দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ-আস্বাদন-ধারণ-বাক্-প্রজনন্ ইত্যাদি শক্তিসমূহকে ও 'অহমস্মি' 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়। যখন 'প্রাণ' দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন দেহযন্ত্রের সচেতন, আন্তর্জ্ঞানিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়াগুলি এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তি প্রাণের সহিত চলিয়া যায়। এই সমস্ত শক্তির সহিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি যথা—রূপ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি প্রত্যাহৃত হয়। যখন দর্শনশক্তিটি চলিয়া যায় তখন যন্ত্রস্বরূপ চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায়, তাহা অর্থাৎ 'রূপ' বা 'আকার' মৃতব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি এবং ইন্দ্রিয়শক্তি-নিচয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য; যখন কোন ইন্দ্রিয়শক্তি প্রত্যাহৃত হয় তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়টিও উহার সহিত প্রত্যাহৃত হয়। যদি সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকে তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার শব্দ বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হইলে শব্দসমূহ প্রত্যাহৃত হইবে। আমরা যে সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা যদি রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বাক্‌শক্তি তখন কি ভাবে থাকিবে? উহা ঐ সময়ে সুপ্তভাবে থাকিবে এবং ঐ বাক্‌শক্তির দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় সেই 'নাম' গুলিরও অর্থাৎ বস্তুবাচক নামগুলিরও অস্তিত্ব চলিয়া যাইবে। ঐ একই প্রকার কারণে ঘ্রাণশক্তিটি প্রত্যাহৃত হইলে উহার সহিত

গন্ধাদি আঘ্রাণরূপ ক্রিয়াও চলিয়া যাইবে। আবার এইরূপ যখন মন ও বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় তখন চিন্তাশক্তি, স্মৃতি, ইচ্ছা, প্রত্যক্ষ ও অনুমানযোগ্য বিষয়সমূহ, মানসিক ভাবরাশি—এই সমস্তই অন্তর্হিত হয়। মৃত্যুকালে দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ এইরূপ নির্ব্বিশেষ-ভাবে একীভূত হইয়া থাকে। আবার ইহা আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে, 'প্রাণ' ও 'প্রজ্ঞা' এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য—একটির অভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটিরও অভাব হইবে। সুতরাং 'প্রাণ' চলিয়া যাইলে তৎসঙ্গে প্রজ্ঞাও চলিয়া যাইবে। যখন কাহারও এইরূপ অবস্থা ঘটে তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

উপরি উক্ত ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহ মৃত্যুর পরে প্রাণের সহিত একীভূত হইয়া জীবাত্মার সহিত থাকে; এবং ঐ জীবাত্মা আবার অন্য এক শরীর ধারণ করিয়া উহাদিগকে প্রকাশ করেন। গভীর নিদ্রার পরে জাগরণের সময় যেমন মানসিক ও দৈহিক শক্তিসমূহ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে; সেইরূপ চিরনিদ্রা বা মৃত্যুর পরে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের সময় সুপ্ত-শক্তিসকল প্রাণরূপ আধার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন নূতন ইন্দ্রিয়যন্ত্রসকল সৃজন করে এবং উহাদের আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকে।* কিন্তু এই ইন্দ্রিয়যন্ত্র-সৃজনকারিণী শক্তিটি কি?

* "ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন ধ্যায়ত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা

উহাই 'প্রাণ' বা জীবনী-শক্তি; উহাই সেই শক্তি যাহার মধ্যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনা, ধারণা এবং ভাব বা প্রবৃত্তিসমূহ সুপ্ত-ভাবে অবস্থান করে।

যখন ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে অর্থাৎ যখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই তাহার নিজ নিজ কার্য্য করিতে বিরত থাকে, তখন ঐ সমস্ত ক্রিয়া একেবারে লুপ্ত না হইয়া সুপ্তভাবেই থাকে; সুতরাং এইরূপ অবস্থায় কোনও ইন্দ্রিয় কিছুই অনুভব করে না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলের আপেক্ষিক সত্ত্বাও ঐ

ভবতি, তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈ র্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নে র্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।"

—৩।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ

"স যদাঽস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি। সহৈ বৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি বাগস্মাৎ সর্ব্বাণি নামান্যভিবিসৃজতে। বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি। ···সৈষা প্রাণে সর্ব্বাপ্তিঃ।"—৪।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ। সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ।"—৪।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

অর্থাৎ—

"যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা; যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। এই প্রাণ এবং প্রজ্ঞা মিলিত হইয়া শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হ'ন।"

সময় অন্তর্হিত হয়। জ্ঞান এবং চৈতন্যের কেন্দ্র হইতেছেন—দেহী বা জীবাত্মা। এই দেহী—'প্রাণ' বা জীবনী-শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই প্রাণের এক অংশ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে প্রকাশ পায় এবং অপর অংশটি গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন অনুভবকর্ত্তা ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির কোনও সম্পর্ক না থাকিলে ঐ বিষয়গুলির অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় যতক্ষণ আছে, বিষয়ীও ততক্ষণ আছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত সত্যে উপনীত হইয়াছি সেই গুলিকে একবার স্মরণ করা প্রয়োজন—আমরা জানিতে পারি-য়াছি, যে ইন্দ্রিয়শক্তিসকল 'প্রাণ' বা জীবনী-শক্তির সম্পূর্ণ অধীন; 'প্রাণ' ও 'প্রজ্ঞা' এই দুইটি এক সঙ্গে বাস করে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ, কারণ ঐ বিষয়গুলির অস্তিত্ব উপলব্ধিকরণক্ষম শক্তিসমূহের উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঐ বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ হইবে সেই শক্তির অভাব হইলে ঐ বিষয়গুলির অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা সমানই। যদি আমা-দের দর্শনশক্তি লোপ পায় তাহা হইলে কোন প্রকার বর্ণই আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে না; আমাদের শ্রবণশক্তি কার্য্যক্ষম না থাকিলে কোন প্রকার শব্দই আমরা শ্রবণ করিতে পারিব না; এইরূপে প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, প্রত্যক্ষী-করণীয় (perception) বিষয়গুলির সহিত সংবেদন-সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এবং প্রত্যক্ষী-করণ ক্রিয়াটিও আবার ইন্দ্রিয়

শক্তির উপরে নির্ভর করে। প্রত্যক্ষীকরণীয় একটি বিষয়কে একখণ্ড বস্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; যেমন বস্ত্রখণ্ড ও বস্ত্রখণ্ডস্থিত সূত্রগুলির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই; সেইরূপ প্রতক্ষীকরণীয় একটি বিষয়ের সহিত সংবেদন ক্রিয়া ও অনুভব-করণক্ষম শক্তিসমূহের কোনও প্রভেদ নাই। অর্থাৎ—যেমন বস্ত্রখণ্ড বলিলে বস্ত্রখণ্ডস্থিত সূত্রগুলিকেই বুঝায়, কারণ ঐ সূত্রগুলি ব্যতীত উহার অন্য উপাদান নাই—সেইরূপ প্রত্যক্ষকরণীয় বিষয় বলিলে উহা প্রত্যক্ষীকরণ ও অনুভব-কারিনী-শক্তির সমষ্টিকেই বুঝায়। আবার প্রত্যক্ষীকরণ ও অনুভবকারিনী-শক্তিরূপ সূত্রগুলি প্রাণশক্তি হইতেই যেন পাক খাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই বিশ্বজগতের অস্তিত্ব প্রাণ ও প্রজ্ঞা ভিন্ন থাকিতে পারে না। আত্মাই বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্বরূপ আবার উহা আমাদের প্রত্যেকেরও কেন্দ্রস্বরূপ; উহা প্রাণের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত এবং উহা হইতেই এই জীবনের এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তির উৎপত্তি। বস্তুতঃ এই দৃশ্যমান বাহ্যজগতের মূলই হইতেছেন আত্মা।

পূর্ব্বেই ইহা কথিত হইয়াছে যে, প্রাণ বা প্রজ্ঞার সংখ্যা বহু নহে—উহা একমেবাদ্বিতীয়ম্। যে জীবনী-শক্তি আপনার ভিতর রহিয়াছে সেই জীবনী-শক্তিই আমার এবং অপরের ভিতরেও রহিয়াছে। জীবনী-শক্তি যেরূপ বহু নহে কিন্তু এক, প্রজ্ঞাও সেইরূপ এক; সুতরাং আপনার মধ্যে যে প্রজ্ঞা রহিয়াছে সেই প্রজ্ঞাই আমার এবং অপরের মধ্যেও রহিয়াছে। এই নিখিল

বিশ্বের সর্ব্বত্রই প্রাণ বা প্রজ্ঞা একটি ভিন্ন দুইটি নহে। অপরের প্রজ্ঞার সহিত আমাদের প্রজ্ঞার তুলনা করিয়া পরস্পরের বৈশিষ্ট্য কেবল বাহ্য লক্ষণ দ্বারা অনুমিত হইতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূলে প্রজ্ঞা অবস্থিত। কারণ কোনও বাক্য উচ্চারিত হইলে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য প্রজ্ঞা বা 'অহমস্মি-জ্ঞান' না থাকিলে বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ কর্ণদ্বারা কোনও প্রকার শব্দ শ্রবণ প্রজ্ঞা ভিন্ন সম্ভবপর নহে। যখন উহা কোনও বিষয়ে বিশেষ নিবিষ্ট থাকে তখন কোনও বস্তু আমাদের চক্ষুর অতি সন্নিকটে থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই না। *

এইরূপ দেখা যায় যে, যখন কেহ পথের মধ্যে কোনও একটি বস্তু-বিশেষের উপর একাগ্রতা সহকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তখন তাহার সম্মুখ দিয়া যাহা কিছু চলিয়া যাউক্ না কেন তাহা তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না; সেইরূপ কোন ব্যক্তি যদি একটি শব্দ-বিশেষের উপর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে অপরাপর শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হয় না; এমন কি সেই সময়ে যদি কেহ তাহাকে তাহার নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্ভাষণ করে, সে তাহা শুনিতে পায় না। সেইরূপে আবার, যদি কাহারও মন বিশেষ কোনও চিন্তায় বা ভাবে নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির তখন দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা অন্য কোনও প্রকার

---

* "ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষু রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতদ্রূপং প্রজ্ঞাসিষমিতি।"—৭।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

অনুভূতিই হইবে না। অতএব সংক্ষেপে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, প্রজ্ঞা ভিন্ন চিন্তাধারার ক্রমিক উদয় হয় না, অর্থাৎ একটি চিন্তা দূর হওয়ার পরই যে অপর একটি চিন্তার উদয় হয়—এই প্রকার নিয়ম প্রজ্ঞা ভিন্ন হইতে পারে না। আবার প্রজ্ঞা না থাকিলে কোনও বিষয় জানিতেও পারা যায় না। তজ্জন্যই ইহা উক্ত হইয়াছে যে "প্রকৃত দ্রষ্টাকেই আমাদের জানিতে হইবে ; বাক্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া উহা যাহার দ্বারা কথিত হইয়াছে সেই বক্তা বা পুরুষকেই জানিতে চেষ্টা করিবে।* সেই বক্তা কোথায় তাহা অনুসন্ধান কর ; দ্রষ্টা কোথায় তাহা অনুসন্ধান কর; বাক্যের অর্থ কি তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত বক্তাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। দৃষ্টির বিষয় কি, তাহা না ভাবিয়া প্রকৃত দ্রষ্টাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। শব্দ কি, তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত শ্রোতা কে, তাহাই জানিতে চেষ্টা কর।" পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 'শব্দ' কি এবং তাহার উৎপত্তি কি প্রকারে হয়—ইত্যাদি নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু শ্রোতা অর্থাৎ যিনি ঐ শব্দ শ্রবণ করিতেছেন তাহা জানিতে তাঁহারা মোটেই উৎসুক নহেন। পক্ষান্তরে বেদান্তদর্শনাভিজ্ঞ সুধীবৃন্দ সমস্ত বিষয়ের মূল কোথায়

---

* "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত ; বক্তারং বিদ্যাৎ।"......"ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, রূপবিদং বিদ্যাৎ।" "ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যাৎ।"

—৩।৮ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

তাহারই অনুসন্ধান করেন। শব্দ বায়ুর কম্পন হইতে জাত কি না তাহা লইয়া তাহারা ব্যস্ত হ'ন না। একটি শব্দ উৎপন্ন হইতে যে কোনও প্রকার স্পন্দন বা কম্পনেরই প্রয়োজন হউক না কেন, আমাদের শ্রবণ-শক্তির সহিত নিশ্চয়ই ঐ শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে। যদি আমাদের শ্রবণ-শক্তিটি প্রত্যাহৃত হয় তাহা হইলে কে ঐ শব্দটি শ্রবণ করিবে? সুতরাং 'শব্দ' এই ব্যাপারটি কি, তাহা জানিবার জন্য সময় নষ্ট করিবার কি আবশ্যক? প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির ধর্ম্ম কি তাহা বিদিত হওয়া আবশ্যক; তাহার পরে উহাদের মূল কোথায় তাহা দেখা প্রয়োজন; সর্ব্বশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের জ্ঞাতা বা উপলব্ধি-কর্ত্তা কে, তাহাই আমাদের জানা আবশ্যক। কোন খাদ্যের কি প্রকার স্বাদ তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া কে আস্বাদন করিতেছেন তাহাকেই জানিতে চেষ্টা কর। সুখ ও দুঃখ এই দুইটি কি তাহা না ভাবিয়া, যিনি উহাদের অনুভব করিতেছেন তাহাকেই বিদিত হও।

এইরূপে 'চিন্তা' ব্যাপারটি কি তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া যিনি চিন্তা করিতেছেন তাঁহাকে বিদিত হও। এই সকল প্রত্যক্ষীকরণ-সাপেক্ষ বিষয়গুলির অর্থাৎ চিন্তা, সুখ, দুঃখ

---

* "নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীত। অন্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ
"ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত।
সুখদুঃখয়ো বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।"

ইত্যাদির সহিত প্রজ্ঞার সংশ্রব আছে এবং ইন্দ্রিয়শক্তিসকলের সহিতও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সম্বন্ধ আছে। যদি বিষয়গুলির সহিত বিষয়ী আত্মার এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ, ইত্যাদি বিষয়ের সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকিত না এবং যদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য না থাকিত তাহা হইলে বিষয়গুলিও থাকিত না। কেবল বিষয় অথবা কেবল বিষয়ী দ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না। *

ইন্দ্র প্রজ্ঞাকে রথচক্রের মধ্যস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেহটি যেন একটি রথ এবং চক্রের বেড় বা পরিধিটি যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ দ্বারা গঠিত। চক্রের নাভি হইতে নেমি পর্য্যন্ত যে দণ্ডগুলি থাকে সেইগুলি যেন বাহ্যবিষয়—প্রকাশক ইন্দ্রিয়শক্তিসকল এবং চক্রের নাভিটি যেন প্রাণ বা জীবনী-শক্তি। † উপরোক্ত উপমা দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে

---

* "তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং, দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যু র্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যু র্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যু র্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিদ্ধেৎ। নো এতন্নানা।"

—৮।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

† "তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ, স এষঃ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।"—৮।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

"যেমন রথচক্রের অরগুলিতে নেমি বা পরিধিস্বরূপ গোলাকার কাষ্ঠ-খণ্ড স্থাপিত হয় এবং নাভি অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত ছিদ্রযুক্ত গোলাকার

যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়শক্তিরূপ দণ্ডগুলির উপর স্থাপিত হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি আবার প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই প্রাণ বা জীবনী-শক্তিকে প্রজ্ঞা ও আত্মা হইতে পৃথক্ করা যায় না। ইহা জরা-মরণ-রহিত এবং আনন্দস্বরূপ আত্মা। * "সৎকার্য্য বা অসৎকার্য্যের দ্বারা আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কোনও প্রকার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। সংসারের পাপ তাপে ইহাকে কলুষিত করিতে পারে না বা ইহার কোনও প্রকার পরিবর্ত্তনও হয় না। আমাদের আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মরহিত অর্থাৎ

কাষ্ঠের অরগুলি স্থাপিত হয় সেইরূপ নেমি স্থানীয় নামাদি বিষয়গুলিও অর-স্থানীয় ইন্দ্রিয়সমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অরস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও নাভি স্বরূপ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা; ইহাই আনন্দ স্বরূপ এবং জরা মরণ রহিত।"

* "ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। এষ লোকপালঃ। এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্ব্বেশঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।"

—৮।৩ কৌষীতক্যুপনিষৎ।

অর্থাৎ এই আত্মা পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা অধিক হন না, অথবা পাপ কর্ম্মের দ্বারা ন্যূন হন না। যেহেতু এই প্রাণপ্রজ্ঞা উপাধিবিশিষ্ট আত্মাই স্বর্গাভিলাষী যে জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্ত্ত্যলোক হইতে উর্দ্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে পুণ্য কর্ম্ম করান এবং এই আত্মাই যে জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্ত্ত্যলোক হইতে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্ম

পাপীও হন না বা পুণ্যবান্‌ও হন না; সর্ব্বসময়েই ইহা পূর্ণ ও পবিত্র। পুণ্যকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মের সহিত আত্মার কোনও সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মের সহিত জীবাত্মার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, কারণ যাহা কিছু করা যায় তাহার ফল জীবাত্মাই ভোগ করিবেন অর্থাৎ 'আমি, আমার' জ্ঞান লইয়া আমরা যেরূপই কর্ম্ম করি না কেন, তাহার ফল আমাদের ভোগ করিতেই হইবে। আমাদের ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে যে, প্রজ্ঞা ও জীবনী-শক্তি ব্যতিরেকে কোন প্রকার সদসৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না অর্থাৎ প্রজ্ঞা এবং জীবনী-শক্তি হারাইয়া কোন প্রকার কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেই পারে না। জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল কারণ যিনি তিনিই এই বিশ্বজগতের অধিপতি ও সকলের পালন-কর্ত্তা। তিনিই এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্য জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই আমার (ইন্দ্রের) প্রকৃত স্বরূপ। এই আত্মজ্ঞান সকলকেই অমরত্বের অধিকারী করে; একমাত্র ইহাই মনুষ্য-জাতিকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে সমর্থ এবং এই পূর্ণতা লাভ হইলেই যে রাজ্যে চির-শান্তি এবং অনাবিল. আনন্দ বিরাজ করিতেছে সেই রাজ্যে মানব গমন করিতে পারে।"

অর্থাৎ পাপকর্ম্ম করান। এই আত্মাই লোকপাল অর্থাৎ সাধু লোককে সুখ এবং অসাধু লোককে দুঃখ প্রদান করেন। এই লোকপাল আত্মাই লোকাধিপতি। এই লোকাধিপতি আত্মাই সর্ব্বনিয়ন্তা, এই সর্ব্বৈশ্বর্য্যগুণসম্পন্ন আত্মাই আমার (ইন্দ্রের) স্বরূপ, ইহাকেই অবগত হইতে হয়। আত্মাকেই আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে।

"ওঁ আপ্যায়স্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্ব-নিরাকরণং মেহস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ-শান্তিঃ ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতৃপ্ত হউক্। আমি যেন উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার প্রত্যাখ্যান না হউক্। আর উপনিষদে আত্মার যে সমস্ত ধর্ম্ম কথিত আছে, তাহা আত্মনিষ্ঠ আমাতে প্রকাশিত হউক্ ॥" ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

আত্মানুসন্ধান

হিন্দুদিগের প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সহিত গ্রীস দেশস্থ পৌরাণিক গল্প সমূহের বহু প্রকার সাদৃশ্য আছে। এই দুই ভিন্ন জাতির পুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতারা ও অসুরেরা নরদেহ ধারণ করিয়া কিরূপে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের মত বাস করিয়াছিলেন। দেবতারা এবং অসুরেরা যে একপদে বাস করিতেন এবং পরস্পর যুদ্ধ করিতেন তাহার উল্লেখ আমরা প্রাচীন উপনিষদ সমূহেও দেখিতে পাই। কথিত আছে যে, এই নিখিল বিশ্বের প্রথম বিধাতা প্রজাপতি একদা দেবগণকে ও অসুরগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা স্থাপন করিবার জন্য কি কারণে যুদ্ধ করিতেছ? তোমরা আত্মাকে বিদিত হও, কারণ যাহার আত্মজ্ঞান আছে তাহার নিকটেই শান্তি আসে। আত্মা পাপবর্জ্জিত, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু রহিত; আত্মার শোক নাই, দুঃখ নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। আত্মা সত্যকাম অর্থাৎ আত্মার কামনা কখনও বৃথা হয় না, উহা কখনও অপূর্ণ থাকে না। আত্মা সত্যসঙ্কল্প ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত—উহাতে মিথ্যা কিছুই নাই, সুতরাং আত্মার সকল প্রকার চিন্তাও সর্ব্বৈব সত্য। সকলেরই এই আত্মাকে অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই

প্রাপ্ত হইবেন ; তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকিবে না। তাঁহার সমস্ত কামনাই পূর্ণ হইবে ; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ হইবেন, সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই তাঁহার নিকট আসিবে এবং তিনি এই সসাগরা পৃথিবীর ও স্বর্গাদির অধীশ্বর হইবেন। *

দেবতারা এবং অস্থরেরা এই উভয় পক্ষই অতিশয় ক্ষমতা-প্রিয় ও নিতান্ত অসুখী ছিলেন ; তজ্জন্য তাঁহারা প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন যে, তাহা হইলে ত সর্ব্ব জগতের এবং সকল জীবের উপর কর্তৃত্ব করিবার সুগম পন্থা পাওয়া গিয়াছে। বেদান্তান্তর্গত অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক ছান্দোগ্য উপনিষদে উপরি উক্ত উপাখ্যানটির সুত্রপাত এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্গত।

হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকে "বেদ" আখ্যা দেওয়া হয়। এই "বেদ" চারিভাগে বিভক্ত যথা :—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব। বৈদিক যুগে সামবেদের মন্ত্রগুলি গান করা হইত। সেই সাম গান হইতে কণ্ঠ-সঙ্গীত-বিজ্ঞান ভারতে

* "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ
সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স
সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্
য স্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥"

৮।৭।১ ;—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

উদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দুরা সর্ব্ব প্রথম কণ্ঠ-সঙ্গীতে সপ্ত স্বর ব্যবহার করিয়াছিল। পরে যন্ত্র সঙ্গীতেও হিন্দুরা সপ্ত স্বর ও তিনটি সপ্তক—উদারা, মুদারা, তারা, (উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত) ব্যবহার করিত। প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্ম্মের সময় সামবেদীয় মন্ত্রগুলি সপ্তস্বরে গীত হইত।

সে যাহা হউক, ছান্দোগ্য উপনিষদের উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, দেবতারা এবং অসুরেরা প্রজাপতির নিকট হইতে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবার গূঢ় তত্ত্বটি জানিতে পারিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে উৎসুক হইলেন। কি প্রকারে এই আত্মার জ্ঞান লাভ হইতে পারে এই বিষয় লইয়া তাঁহারা আপনাদের ভিতর আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হয় এবং সমস্ত পৃথিবীর কর্ত্তা হইতে পারা যায় তাহারই অনুসন্ধানে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

এই স্থানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই অসুরগণ ভূত প্রেত জাতীয় জীব নহেন; ইহারা মনুষ্যেরই মত এক জাতি ছিলেন; ইহারা ঘোরতর ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। ইহারা জড়বাদী ছিলেন এবং মনে করিতেন যে, এই জড় দেহই সর্ব্বস্ব, এই দেহের নাশের সহিত সবই শেষ হইয়া যায়। সমস্ত বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করিবার অভিলাষ তাহারা সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতেন; ইহাদের এই বাসনা কোন কালেই পূর্ণ হয় নাই। যাহাদের বাসনা অসংখ্য তাহাদের অভাবও অসংখ্য;

ইহাদেরও তাহাই হইয়াছিল। আবার কোন একটি বাসনা পূর্ণ হইলে দেখা যায় যে, অপর বাসনাগুলি আরও তীব্র বেগে জাগরিত হইয়া উঠে ; সেইজন্য ইহারা সর্ব্বদাই অভাব-গ্রস্ত বোধ করিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও শক্তিমান্ হইবার চেষ্টা করিতেন। যে সকল জড়বাদী মনুষ্যের এইরূপ প্রবৃত্তি ছিল তাহাদিগকে বেদে 'অসুর' বলা হইয়াছে। আর যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ আধ্যাত্মিকগুণ সম্পন্ন, ও স্বার্থত্যাগী, পরহিতকারী এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ, ঐশ্বর্য্য ও পার্থিব ভোগ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য না মনে করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করা জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন—বেদে তাঁহারা 'দেবতা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। *

এই সকল দেবতারা এবং অসুরগণ স্থির করিলেন যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহাকে কোনও সত্যদর্শী ঋষির নিকট আত্মজ্ঞান লাভের উপায় জানিবার জন্য পাঠাইতে পারেন তাহা হইলেই, তাঁহাদের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিবার সুবিধা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে দেবগণ ইন্দ্রের নিকট এবং অসুরগণ বিরোচনের নিকট গমন করিলেন। উভয়পক্ষই তাহাদের রাজাকে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে গমন করিবার জন্য

* ভগবদগীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দেবতা ও অসুরদিগের স্বভাব, চরিত্র ও গুণসমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরোধ করিলেন। বস্তুতঃ উভয়পক্ষেরই সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল ; মনুষ্যের যত প্রকার পার্থিব ভোগ্য বিষয়ের অভিলাষ থাকিতে পারে, তাহার কোনটিরই অভাব তাহাদের ছিল না। যদিও তাঁহাদের প্রচুর ধন, সম্পত্তি ও বিলাস সামগ্রী ছিল, যদিও তাঁহারা অসীম মানসিক শক্তি (Psychic power) সম্পন্ন ছিলেন এবং যাহা কামনা করিতেন তাহাই প্রাপ্ত হইতেন, তথাপি এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও তাঁহাদের বিষয়ভোগ-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা অতৃপ্ত বাসনাজনিত দুঃখই পাইতেছিলেন। তাঁহাদের যে সকল শক্তি ও সামর্থ্য ছিল তদপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও ক্ষমতা পাইবার জন্য তাঁহারা লালায়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যখন প্রজাপতির নিকট শুনিলেন যে, এমন কোন বস্তু আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে নিখিল বিশ্বের অধিপতি হইতে পারা যায়, তখন তাঁহারা ঐ বস্তুটি অবিলম্বে লাভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুরপতি বিরোচন আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের অনুসন্ধানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তৎকালে সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস বর্জ্জন করিলেন ; এবং তাঁহাদের সুন্দর পরিচ্ছদাদি ও যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও বিলাস-দ্রব্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, উভয়েই পরস্পরের সহিত কোনও সংশ্রব না রাখিয়া জিজ্ঞাসুর ন্যায় দীন ও সরলভাবে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের অন্বেষণ করিতে

লাগিলেন। তাঁহারা ঐরূপ সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ কোথায়ও না পাইয়া প্রজাপতির সমীপে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সমিৎপাণি হইয়া পূজোপহার নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে রিক্তহস্তে গুরু, দেবতা ও রাজার নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ। এইজন্য তাঁহারা হব্য, ফল এবং যজ্ঞকাষ্ঠাদি প্রজাপতিকে ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার সম্মতি পাইয়া তাঁহারা তাঁহার শিষ্যরূপে পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিলেন, এবং বিধিপূর্ব্বক গুরুর সেবা করিয়া বত্রিশ বৎসর গুরুর নিকট বাস করিলেন। একদিন প্রজাপতি তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে তাঁহার নিকট আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তাঁহারা দুইজনেই উত্তর করিলেন:— ভগবন্ আপনি বিশ্বজগতের বিধাতা, প্রজাপতি; আপনার নিকট শুনিয়াছি যে, যদি কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরম সুখী হয়; তাহার সমস্ত প্রকার শক্তিলাভ হয়, কিছুই তাহার অপ্রাপ্তব্য থাকে না। ঐ আত্মা আবার পাপ ও জরারহিত, অজ এবং অমর, ঐ আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই নাই—ইহাই সত্যকাম অর্থাৎ ইহার যাবতীয় কামনা সর্ব্ব সময়েই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহা সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ ইহার চিন্তাও কখনও নিষ্ফল হয় না। আমরা সেই আত্মাকে জানিবার অভিলাষে আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমরা এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির আশায় আপনার নিকটে আসিয়াছি।

ইন্দ্র ও বিরোচনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি

শিষ্যদ্বয়ের বুদ্ধি শুদ্ধ কি না তাহা পরীক্ষা করিবার মানসে একেবারেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ঈপ্সিত আত্মজ্ঞান দান করিলেন না; প্রকারান্তরে তিনি তাঁহাদিগকে কয়টি উপদেশ দিলেন যাহা দ্বারা তাঁহারা অন্তরস্থিত আত্মার অনুসন্ধান করিয়া সেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে আচার্য্য তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতির পথে ক্রমে ক্রমে পরিচালিত করেন, এবং যাহাতে শিষ্যেরা নিজ চেষ্টায় সেই একমাত্র সত্যবস্তুকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করেন, সেই আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ পদবী বাচ্য। এইজন্য তাঁহাদের গুরুদেব—(যিনি গুরুরূপী স্বয়ং প্রজপতি)—বলিলেন "বৎসগণ, চক্ষুতে যাঁহাকে দেখা যায় তিনিই সেই আত্মা; এবং এই আত্মাই জন্ম, শোক, দুঃখ ও পাপ বর্জ্জিত; ইহার মৃত্যুও নাই, শঙ্কাও নাই। * এই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া লোক সমগ্র পৃথিবী ও ঈপ্সিত বিষয় সকল পাইতে পারে"। আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া তাঁহারা সংশয়ে পড়িলেন। "চক্ষুতে যাঁহাকে দেখা যায় তিনিই আত্মা" এই বাক্যের গূঢ় অর্থ উক্ত শিষ্যদ্বয় বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন যে, চক্ষুর তারাতে যে ছায়া দেখা যায়, ঐ ছায়াকেই বোধ হয় গুরুদেব আত্মা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা যদি কাহারও চক্ষুর তারকাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি

---

* "তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। ৮।৭।৪ ছা, উ।

তাহা হইলে আমাদেরই প্রতিবিম্বটি ক্ষুদ্র ছায়াকারে ঐ চক্ষুর তারকাতে প্রতিফলিত দেখিয়া থাকি। প্রজাপতি অবশ্য এই প্রকার ছায়াকে আত্মা বলিয়া মনে করিবার উপদেশ দেন নাই। তিনি কেবল শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ, যাঁহাকে দ্রষ্টারূপে অনুভব করিয়া থাকেন সেই দর্শনকর্ত্তা ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক আত্মারূপী পুরুষকেই উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্, যাঁহাকে দর্পণে বা সলিলের ভিতর দেখা যায় তিনি কে? চক্ষুর মধ্যে যাহাকে দেখা যায় তিনি কি সেই একই পুরুষ?"* শিষ্যেরা যে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রজাপতি বলিলেন, "অবশ্য তোমরা যাহা বলিতেছ সেই সমস্ত পদার্থের ভিতরেও সেই আত্মাকে দেখা যায়, সেই আত্মাকে বিদিত হও এবং উপলব্ধি কর।" প্রজাপতি তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের বুদ্ধিশক্তি আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "একটি জলপূর্ণ পাত্রে তোমাদের আকৃতি নিরীক্ষণ করিও এবং তাহাতে আত্মাকে দর্শন করিতে পাও কি না তাহা আমাকে বলিও।" অনুগত শিষ্যদ্বয় গুরুর আদেশানুযায়ী জলের মধ্যে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব দর্শনান্তর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আপনি

---

* "অথ যোহয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্ব্বেষ্বেতেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ।"—৮।৭।৪ ছা, উ॥

যাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়াছি।” ইহা শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি বলিলেন, “তোমরা আত্মা দেখিয়াছ না আর কিছু দেখিয়াছ ?” শিষ্যেরা বলিলেন, “ভগবন্, আমরা জলের মধ্যে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত আমাদের আকৃতি স্পষ্টভাবে দেখিয়াছি, উহার মধ্যে আমাদের শরীরের কোনও অংশের ব্যতিক্রম হয় নাই—এমন কি আমাদের কেশ ও নখর পর্য্যন্ত দেখিয়াছি।” তখন প্রজাপতি তাঁহাদিগের সংশয় অপনোদনের জন্য আবার বলিলেন, “তোমরা তোমাদের কেশ ও নখর সংস্কার পূর্ব্বক উত্তম বেশভূষাদিতে সজ্জিত হইয়া আবার জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর এবং যাহা দেখিতে পাও তাহা আমাকে বল।” তখন ঐ শিষ্যদ্বয় প্রজাপতির আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিবার জন্য কেশ ও নখরাদির সংস্কার সাধনানন্তর বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া জলের মধ্যে তাহাদের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। তদনন্তর প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎসগণ, তোমাদের স্বরূপ বা আত্মাকে কি দেখিতেছ ? তাঁহারা উত্তর করিলেন, “ভগবন্, আমরা এখন যেমন পরিষ্কৃত বেশভূষায় সজ্জিত আছি সেইরূপ অবস্থাতেই আমাদের দেখিতেছি।” তাহা শুনিয়া আচার্য্যদেব বলিলেন, “উহাই তোমাদের ‘আত্মস্বরূপ’, উহাই সেই দুঃখ ও ভয় বর্জ্জিত অবিনশ্বর ব্রহ্ম—উহাকে ভাল করিয়া বিদিত হও এবং উপলব্ধি কর।” ইহা শুনিয়া শিষ্যদ্বয় শান্তচিত্তে প্রস্থান করিলেন। গুরুরূপী প্রজাপতি তাহাদিগকে অনেক দূরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোমরা তোমাদের আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞানলাভ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছ ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ দেবতা অথবা অসুর এই ভ্রান্ত আত্মবিদ্যা অনুসরণ করিবে সেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।" ইন্দ্র এবং বিরোচন উভয়েই প্রজাপতির এবম্বিধ বাক্য শুনিয়াও প্রত্যাগত হইলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তেই তাঁহারা নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর বিরোচন স্থূল দেহই আত্মার স্বরূপ এই নিশ্চয় করিয়া অসুরগণের সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট দেহাত্মবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি অসুর-দিগকে আধুনিক নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীদের (যাঁহারা মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই—এই মত পোষণ করেন তাঁহাদিগকে অজ্ঞেয়বাদী বলে) মতানুযায়ী জড়বাদের উপদেশ-গুলি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "স্থূল দেহই আমাদের আত্মা, কেবল এই দেহেরই পরিচর্য্যা করিতে হইবে এবং এই দেহকেই পূজা করিতে হইবে। এইরূপে স্থূল দেহের পূজা ও সেবার দ্বারা আত্মা মহিমান্বিত হইবেন ; যিনি দেহকে আত্মা জানিয়া ইহার পরিচর্য্যা করিবেন তিনিই সমগ্র পৃথিবীর এবং স্বর্গাদি লোকের অধীশ্বর হইতে পারিবেন এবং সমস্ত বস্তুই তাঁহার করতলগত হইবে।" অসুরেরা তাঁহার উপদেশানুযায়ী সম্পূর্ণভাবে দেহাত্মবাদী হইয়া স্থূল শরীরটিকেই নানাবিধ বেশ-

ভূষায় সুসজ্জিত করিতে লাগিল এবং দেহের পূজা করিতে লাগিল। অদ্যাবধি অসুরেরা দেহের পরিচর্য্যা করিয়া ত্রিভুবন জয় করিব এইরূপ মনে করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালেও পৃথিবীতে এইরূপ অসুর-প্রকৃতির লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, যাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী, জড়বাদী এবং স্বার্থসুখ পাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেই আসুরিক প্রবৃত্তি-সমূহ পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর লোক নিজ দেহ সম্পর্কীয় চিন্তা ব্যতীত অন্য কাহারও বিষয় চিন্তা করেন না। ইহাদের মধ্যে 'দয়া' বলিয়া কোন গুণ নাই—দরিদ্রকে ইহারা এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেও কাতর হয়। ইহাদের নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ ভিন্ন অন্য কোন উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ নাই। ইহারা স্থূল দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন।

আধুনিক আসুরিক মনুষ্যেরা ভগবানের উদ্দেশ্যে কোন সৎকর্ম্ম করেন না। ইহারা জীবিত বা মৃত দেহটিকে বিচিত্র বেশভূষায় ও গন্ধ পুষ্পাদিতে সজ্জিত করেন। ইহাদের ধারণা যে, দেহের এইরূপ পরিচর্য্যা করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারিবেন।

সে যাহা হউক, এদিকে সুরপতি ইন্দ্রের বুদ্ধি বিরোচন অপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম ছিল। তিনিও নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাহা দেবগণের মধ্যে প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করিতে

লাগিলেন। প্রজাপতি বলিয়াছিলেন যে, আত্মস্বরূপের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, মৃত্যু, শোক কিছুই নাই এবং ইহা নিত্য বস্তু। এই বহুমূল্য বাক্য স্মরণ করিয়া ইন্দ্র মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন,—"এই দেহ কখনও আত্মা হইতে পারে না। কারণ এই পরিবর্ত্তনশীল দেহের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সমস্ত বিকারই রহিয়াছে। যখন এই দেহ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন তখন গুরুদেব কি করিয়া এই দেহের প্রতিবিম্বকেই আত্মা বলিয়াছিলেন ? আমি ত এই উপদেশের কোনও সার্থকতা দেখি না।" এইরূপে সন্তোষ লাভ না করিয়া ইন্দ্র শিষ্যের ন্যায় পূজোপহার হস্তে লইয়া প্রজাপতির নিকট আবার উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি সত্যস্বরূপ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছ এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ এইরূপ ধারণা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিরোচনের সহিত চলিয়া গিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ কি ?" ইন্দ্র উত্তর করিলেন, "ভগবন্, যখন এই দেহের পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই তখন এই দেহের প্রতিবিম্বটি কি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হইতে পারে। যদি স্থূল দেহকে বেশভূষা ও পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে ছায়ারূপী স্বরূপের আকৃতিও ভিন্ন হইয়া যায়। চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট হইলে দেহের প্রতিবিম্বরূপী আত্মাও অন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে ; আবার, দেহটি খঞ্জ হইলে প্রতিবিম্বরূপী আত্মাও খঞ্জ দেখাইবে ; দেহটি বিকলাঙ্গ হইলে আত্মাও বিকলাঙ্গ দেখাইবে এবং সর্ব্বশেষে দেখিতেছি যে,

দেহের নাশ হইলে আত্মারও নাশ হইবে। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল দেহের প্রতিবিম্বটি কখনই আত্মা হইতে পারে না; অতএব আমি এই শিক্ষার কোনও সার্থকতা দেখিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমার সংশয় দূর করিয়া দিন, এবং যাহাতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি সেই প্রকার উপদেশ দিন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য প্রজাপতি উত্তর করিলেন, "ইন্দ্র, তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তি সঙ্গত। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আমি ব্যাখ্যা করিব। তুমি আমার নিকট শিষ্যরূপে আরও বত্রিশ বৎসরকাল বাস কর।"

ইন্দ্র গুরু-সেবাপরায়ণ হইয়া তথায় বত্রিশ বৎসর যাপন করিলেন। ইন্দ্রের পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য্য ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া প্রজাপতি একদিন তাঁহাকে বলিলেন—"যিনি নিদ্রাকালে বহুবিধ স্বপ্নবিষয় ভোগ করেন তিনিই আত্মা এবং তিনিই অমৃত ও ভয়হীন ব্রহ্ম। ইঁহাকে উপলব্ধি কর, ইঁহার অনুভূতি লাভ কর।"* এই উপদেশ শ্রবণান্তে ইন্দ্র শান্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেবতাগণকে এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিলেন যে, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার তখনও সন্দেহ রহিয়াছে। তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, দেহের ছায়াটি এবং স্বপ্নবিষয় যিনি ভোগ করেন সেই আত্মা এক নহে; কারণ বাহ্যাকৃতির পরিবর্ত্তনে ত আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। যদি দেহটি

* য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। —৮।১০।১ ছা, উ॥

চক্ষুহীন হয়, আত্মা অন্ধ হ'ন না ; দেহ খঞ্জ হইলে আত্মা খঞ্জ হ'ন না অথবা দেহের কোনও প্রকার অনিষ্ট হইলে আত্মার কোনও অনিষ্ট হয় না। সুতরাং স্থূল শরীরের কোনও দোষেই এই স্বপ্নদ্রষ্টা আত্মা নিশ্চয়ই দূষিত বা কলুষিত হ'ন না। কিন্তু দেহস্থিত যে পুরুষ স্বপ্নজাত বিষয় সমূহ ভোগ করেন, তিনি কিরূপে অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা হইতে পারেন, যখন তাঁহাকে দুঃখদায়ক স্বপ্ন দর্শন করিয়া যন্ত্রণাদি ভোগ করিতে হয় এবং স্থূল দেহের মত তাঁহাকে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও ভয়ের অধীন হইতে হয়। এইরূপে মনে মনে আলোচনা করিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "আমি এই উপদেশে কোন সুফল দেখিতেছি না, আবার আমি গুরুদেবের নিকট যাইব এবং তাঁহাকে এই সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব।" এই বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ইন্দ্র সমিৎ হস্তে লইয়া সেই প্রজাপতির নিকট তৃতীয়বার উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্, আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, আত্মা অপরিবর্ত্তনীয়, অমর এবং জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা বর্জ্জিত, তাহা হইলে স্বপ্নদর্শী পুরুষ কিরূপে আত্মা হইতে পারেন ?" ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য প্রজাপতি বলিলেন, "ইন্দ্র, তুমি ঠিকই বলিয়াছ ; আত্মা সম্বন্ধে আমি তোমায় আবার উপদেশ দিব, তুমি আমার নিকট আরও বত্রিশ বৎসর বাস কর।"

এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন, "গভীর নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি পূর্ণবিশ্রাম ভোগ

করেন, অর্থাৎ যিনি সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্য এবং যিনি কোনও স্বপ্নাদি দর্শন করেন না, তিনিই সেই মৃত্যুহীন আত্মা।" ইন্দ্র এবম্প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন, কিন্তু দেবতাদিগের নিকট যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সন্দেহ হইল যে, "যখন 'আমি আমার' রূপ অহং-জ্ঞানই থাকে না তখন ইহা কিরূপে আত্মা হইতে পারেন? সুষুপ্তি অবস্থায় কোনও প্রকার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তাহা হইলে আচার্য্যদেব কি সর্ব্ব-প্রকার চিন্তা, অনুভূতি এবং জ্ঞানের শূন্যাবস্থাকেই 'আত্মা' বলিয়াছেন?" সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদের কোনও প্রকার বাহ্য-জ্ঞান থাকে না, আমরা তখন স্বপ্নাদিও দর্শন করি না, তখন মনের মধ্যে সুখদুঃখাদি ভাবের অনুভূতি ও অহং-জ্ঞান, এবং কোন ইন্দ্রিয় কার্য্য থাকে না। এই প্রকার শূন্যাবস্থা কিরূপে আত্মা হইতে পারে ইন্দ্র তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া সমিৎ হস্তে লইয়া পুনরায় প্রজাপতির সন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুনরায় আসিবার কারণ কি? ইন্দ্র বলিলেন, "অহং-জ্ঞান শূন্য, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য বিষয়ানুভূতি-রহিত অবস্থাকেই কি আপনি 'আত্মা' বলিয়াছেন?" আচার্য্যদেব উত্তর করিলেন, "না, তাহা নহে।" এইস্থানে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিচক্ষণ আচার্য্যগণ কিরূপে তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর রাজ্যে ক্রমশঃ লইয়া যাইয়া সর্ব্বশেষে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ দিয়া থাকেন।

আমরা যদি চিন্তা, অনুভূতি ও ভাব রাজ্যের উপরে সুষুপ্তি অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া আরও উপরে অগ্রসর হইতে পারি তাহা হইলেই আমাদের আত্মা সাক্ষাৎকার হয়। প্রজাপতি ইন্দ্রের পুনরাগমনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, "তুমি বুদ্ধিমান্, আমি তোমাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আরও কিছু বলিব ; তুমি আমার নিকট আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বাস কর।"

এই পাঁচ বৎসর অন্তে প্রজাপতি ইন্দ্রকে উচ্চতম জ্ঞান দান করিলেন। কথিত আছে যে, এই দৃশ্যমান স্থূল-শরীর 'আত্মা' হইতে পারে না। ইহা মরণশীল ; বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বদা মৃত্যুগ্রস্ত।* এই দেহ যতদিন থাকে ততদিন ইহা প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হয়। দেহের প্রত্যেক পরমাণুর অবিরাম পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়া যদি অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হয়, তাহা হইলে দেহের বিনাশ হইবে। এই শরীর সর্ব্বদাই মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে ; সর্ব্বদাই ইহার মধ্যে মৃত্যুর ক্রিয়া চলিতেছে। এই স্থলে 'শরীর' শব্দে ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত শরীর বুঝিতে হইবে। এই শরীরই আত্মার আবাসস্থান বা যন্ত্র স্বরূপ ; কিন্তু আত্মা দেহ রহিত ও অমর। এই দেহরূপ যন্ত্রের সাহায্যেই

---

* মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যা শরীরস্যা-ত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।
—৮।১২।১ ছা, উ॥

আত্মা বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আসেন। যদি আত্মা এই স্থূল শরীর নির্ম্মাণ না করিতেন তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াদির সংস্পর্শে আসিয়া ভোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্মার ভোগের জন্যই এই শরীরের সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব। আত্মা দেহেতে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই কারণে জীব দেহাভিমানী হইয়া থাকে এবং 'আমি এই শরীর' ইত্যাকার ধারণা করিয়া সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ অনুভব করে। কিন্তু শরীর কিছুই অনুভব করে না। আত্মাই দেহের কর্ত্তা ও প্রভু এবং শরীরটি তাঁহার বাস গৃহ।

যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া বাহ্য বিষয়সকল গ্রহণ করেন তিনিই আমাদের অন্তরস্থ আত্মা। ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির সহিত বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শ হইলেই ইন্দ্রিয়বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। যতক্ষণ আত্মা দেহরূপ স্থূল আকারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত না হ'ন ততক্ষণ স্থূল বাহ্য বস্তুগুলি আকার বিশিষ্ট বলিয়া সাক্ষাৎভাবে আত্মার সংস্পর্শে আসিতে পারে না। কিন্তু এই দেহের জ্ঞাতা, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিষয়ানুভূতির, ভোগকর্ত্তা এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কর্ত্তা সেই আত্মা স্বভাবতঃই অরূপ (Formless), অর্থাৎ তাঁহার কোনও আকার নাই। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন, "আত্মার বিশেষ কোনও প্রকার আকার নাই।" আত্মা দেহের মধ্যে কোনও প্রকার আকারবিশিষ্ট না হইয়া বিরাজ করেন। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেহের আকার থাকিলেও আত্মার কোনও আকার নাই। তাহা হইলেই দেহের

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না—এই কথা আমরা বুঝিতে পারিব। সুতরাং আত্মা যদি অরূপ (Formless) হ'ন, তাহা হইলে দেহের ছায়া কিরূপে আত্মা হইতে পারে? অসুররাজের (বিরোচনের) বুদ্ধি তমোগুণাবৃতা ও তাঁহার মন অপবিত্র ছিল, সেই জন্য তিনি আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হ'ন নাই। তিনি যদি পরে ঐ বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করিতেন, তাহা হইলে প্রজাপতি সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিবেন বলিয়াই অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু বিরোচন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্তই অবগত হইয়াছেন এই মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের যোগ্য পাত্র নহেন, এই বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি জোর করিয়া নিজ শক্তি সঞ্চার দ্বারা তাঁহাকে উক্ত জ্ঞান দান করিতে ব্যস্ত হ'ন নাই। এই কারণে বিরোচন সেই অরূপ ও অমর আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হ'ন নাই।

যাবতীয় ইন্দ্রিয়যন্ত্র, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিষয়ানুভূতি, বস্তুতঃ দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই ক্ষণস্থায়ী। আমরা যদি এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে অবিনশ্বর আত্মা ও বিনশ্বর দেহ যে, একই নহে তাহা বুঝিতে পারিব। কিয়ৎকালের জন্য এই অরূপ আত্মা দেহের মধ্যে বাস করেন এবং ইহা পরিত্যাগ করিবার পরে সেই অরূপই থাকেন। যতক্ষণ এই আত্মা কাহারও দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন ও সেই দেহধর্ম্মযুক্ত হ'ন ততক্ষণ আত্মা সুখ দুঃখভোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

কিন্তু যিনি আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত দেখেন তাঁহার আর সুখ দুঃখ বোধ থাকে না। ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অরূপ আত্মা কিরূপে আকার বিশিষ্ট দেহের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে পারেন? ইন্দ্রের মনের এইরূপ সংশয় দূর করিবার জন্য প্রজাপতি বলিলেন— * কিন্তু আমরা জানি যে, বায়ুর কোনও রূপ বা আকার নাই, বাষ্পেরও কোন আকার নাই, তড়িৎশক্তিরও কোনও আকার নাই, কিন্তু ইহারা আকারের মধ্য দিয়াই প্রকাশমান হয়। যখন বায়ু বহিতে থাকে (যদিও ইহার কোনও আকার নাই) তখন ইহা আকার-বিশিষ্ট বস্তুগুলির সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের সঞ্চালন করে এবং তাহার দ্বারাই বায়ুর আকার ও ক্ষমতা প্রকাশ পায়, এইরূপ, বাষ্পও আকারশূন্য, কিন্তু বাষ্পীয় যানের দ্বারা আমরা ইহার বিশাল শক্তির প্রকাশ দেখিয়া থাকি। আমাদের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) তড়িৎ-শক্তিতে পরিপূর্ণ হইলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু বিদ্যুৎ বা বজ্রপাত

---

* অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্ যথৈ-তান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥

—৮।১২।২ ছা, উ ॥

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রযোগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥

—৮।১২।৩ ছা, উ ॥

ইত্যাদিতে উহার অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। আমরা বাস্তবিক এই বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িৎ শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি না। মারকণি (Merconi) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অনুগ্রহেই এই অদৃশ্য তড়িৎ-প্রবাহের উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি—বেতারবার্ত্তাতেই এই প্রকার তড়িৎ-শক্তির পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। কেহ কখনও কোন অরূপ শক্তিকে চক্ষুদ্বারা দর্শন বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন নাই। ইহাদের অস্তিত্ব কোনও আকারের উপর প্রকাশ হইলেই বুঝিতে পারা যায়। যেমন অবস্থা বিশেষে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অরূপ শক্তিসমূহকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেইরূপ এই আত্মা স্বভাবতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও স্থূল দেহের মধ্য দিয়া ইহার ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের অন্তরে চিন্তারূপে প্রকাশিত না হইলে আত্মার যে, চিন্তাশক্তি আছে তাহা কিরূপে জানা যাইবে? এই প্রকারে আত্মার দর্শন-শক্তি ও অনুভবশক্তির অস্তিত্ব উহাদের বাহ্য প্রকাশের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। যদি কোনও ব্যক্তির দর্শন-শক্তির প্রকাশ না থাকে তাহা হইলে তাহাকে আমরা অন্ধ বলিয়া থাকি। যাহার মানসিক শক্তি ও বোধশক্তি সুপ্ত ভাবে থাকে তাহাকে আমরা মূঢ় বলিয়া থাকি; কিন্তু যখনই এই সমস্ত শক্তি প্রকাশমান হয় তখনই আমরা ইহাদের কার্য্য দেখিয়া থাকি। যদি দেহের মধ্য দিয়া দর্শনশক্তি ঘ্রাণশক্তি, আস্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি, চিন্তাশক্তি

ইত্যাদির প্রকাশ দেখা না যাইত তাহা হইলে আত্মার মধ্যে নিহিত ঐ সকল শক্তি সম্বন্ধে আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারিতাম না। উক্তপ্রকার শক্তিগুলি আমাদের অন্তরস্থ স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়। অবিদ্যাবশতঃ এবং দেহাত্মভ্রমপ্রযুক্ত আমরা মনে করি যে, ঐ সমস্ত শক্তি দেহ হইতেই উৎপন্ন হয়; কিন্তু যখন আত্মজ্ঞানরূপ সূর্য্যের উদয় হয় তখন সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার দূরে চলিয়া যায় এবং সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন চৈতন্যময় আত্মা দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রকটিত হ'ন। যেমন কোন মূঢ় ব্যক্তি আকাশ হইতে বায়ু, মেঘ এবং তড়িৎ-শক্তির পার্থক্য দেখিতে পায় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানরহিত মূঢ় ব্যক্তিও আত্মাকে স্থূল ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে দেখিতে পায় না। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন কেবল তিনিই উপলব্ধি করেন যে, আত্মাই উত্তম পুরুষ। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সুখী; এবং স্থূলদেহের সুখ, দুঃখ চিন্তা না করিয়া ক্রীড়াজ্ঞানে পার্থিব জীবনের সকল অবস্থা উপভোগ করেন। তিনি তাঁহার স্থূল দেহকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আবাস স্থান বলিয়াই জানেন।

আমরা পূর্ব্বেই বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, আত্মাতে প্রজ্ঞা আছে আবার প্রাণ-শক্তিও আছে। এই প্রজ্ঞা ও প্রাণশক্তি পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগতের ভিত্তির মূলে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ সুপ্তভাবে থাকে তখন বাহ্যজগতের কোনও প্রকার ক্রমবিকাশ হয় না। জগতে যত

প্রকার কম্পন আছে (উহা ব্যাপক ভাবেই হউক বা 'আণবিকই হউক) এবং যত প্রকার গতি আমরা অবগত আছি তাহা প্রাণশক্তির ক্রিয়া বা বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। প্রজ্ঞার প্রকাশ মনুষ্যজাতির মধ্যে এমন কি ইতরপ্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। এই প্রজ্ঞার স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই - তবে প্রভেদ আছে কেবল বিকাশের মাত্রাতে। যেখানেই প্রজ্ঞার বিকাশ, জীবনী-শক্তির ক্রিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকার শক্তির ক্রিয়া দেখা যাইবে, সেইখানেই আত্মার প্রকাশ আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন প্রকার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। প্রথমে 'আমি আছি' এই প্রকার অস্তিত্বের জ্ঞান না থাকিলে কাহারও অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। বুদ্ধির মলিনতা বশতঃ আমরা আমাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপকে জানিতে না পারিলেও আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞার বিকাশ থাকিবেই। বেদান্তদর্শন বলেন, যদি আমরা এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতকে অনবরত বিশ্লেষণ করিয়া ইহার কারণানুসন্ধান করি তাহা হইলে আমরা সর্ব্বশেষে দুইটি মূলতত্ত্বে উপস্থিত হইব—একটি প্রজ্ঞা এবং অপরটি প্রাণ। এই দুইটি আবার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং সেই বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও মন বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার আধার ও উৎপত্তি স্থান।

প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন:—আত্মাই নিখিল বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যবস্তু। ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞান হইলে আমরা

আমাদের ব্যষ্টি-স্বরূপ আত্মাকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিতে পারি না, কারণ এই নিখিল বিশ্বে এক আত্মাই সচ্চিদানন্দ সমুদ্ররূপে বিরাজমান। এবং ইহাকেই ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি নানাবিধ নামে অভিহিত করা হয়। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যখন আমাদের পাঞ্চভৌতিক আকারের মধ্য দিয়া প্রকাশ হ'ন তখন ব্যষ্টিভাবে উহা আমাদের ব্যক্তিগত 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত হ'ন এবং এই আত্মাই আমাদের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার মূলে বর্ত্তমান।

আমাদের বাসনাসমূহ আমাদের মানসিক ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন আকার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যদি সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার মূলে প্রজ্ঞা অর্থাৎ 'অহং' জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে বাসনাগুলি আমাদের অন্তরে উদয় হইত না ; এমন কি তাহাদের অস্তিত্বও থাকিত না। যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি এই জীবদ্দশায় সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিয়া কেবল আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন এবং অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পতিত হইলে কখনও উত্তেজিত বা বিচলিত হ'ন না। আত্মজ্ঞান আত্মজ্ঞানীকে পরিদৃশ্যমান জাগতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাধারণের যে বিক্ষোভ হয় তাহা হইতে রক্ষা করে। যেমন শকটে অশ্ব সংযোজিত হইলে উহা চলিতে থাকে, সেইরূপ প্রজ্ঞাযুক্ত জীবও দেহরূপ রথে সংযোজিত হইয়া ইহাকে প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপ শক্তি দ্বারা ইহার যাবতীয় কার্য্য করাইতেছেন। অথবা এই দেহটিকে যদি আমরা একটি মোটর যানের সহিত তুলনা করি তাহা

হইলে মোটর যানটি যেমন বিদ্যুতাধার যন্ত্র (Dynamo) হইতে অদ্ভুত তড়িৎ-শক্তিবলে চলিয়া থাকে ; সেইরূপ এখানে আত্মা হইতে প্রেরিত প্রাণ-শক্তির দ্বারা এই দেহ সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে। যদি আত্মা এই ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলি হইতে পৃথক্ হইয়া যায় বা ঐগুলিতে সংযুক্ত না থাকে তাহা হইলে চক্ষু কিছু দর্শন করিবে না, কর্ণ কিছু শ্রবণ করিবে না, নাসিকা কিছু আঘ্রাণ করিবে না, জিহ্বা কিছু আস্বাদন করিবে না, হস্তপদাদিও কোন কার্য্যই করিবে না। ইন্দ্রকে প্রজাপতি আরও বলিলেন, * "চক্ষু ইন্দ্রিয়টি কেবল একটি যন্ত্র মাত্র। প্রকৃত দ্রষ্টা চক্ষু-তারকার পশ্চাতে অবস্থান করেন। এই দ্রষ্টা ও যিনি দৃষ্ট-বস্তুর জ্ঞাতা তিনিই আত্মা। নাসিকাদ্বয়ও ঐরূপ যন্ত্র মাত্র—আঘ্রাণকর্ত্তাই আত্মা (জীবের প্রকৃত স্বরূপ)। জিহ্বা আস্বাদন ও বাক্‌শক্তির যন্ত্র মাত্র—যাহা বলা যায় তাহা যিনি উচ্চারণ করাইতেছেন এবং তাহার বিষয় যিনি জানিতেছেন তিনিই অন্তরস্থিত চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা। কর্ণেন্দ্রিয় শ্রবণশক্তির যন্ত্র মাত্র কিন্তু শ্রবণকর্ত্তা হইতেছেন আত্মা।" †

---

* অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ
পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যোঽবেদেদং জিঘ্রাণীতি
স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি
স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি
স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্॥—৮।১২।৪ ছা, উ॥

† অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে॥—৮।১২।৫ ছা, উ॥

যিনি চিন্তা করিয়া থাকেন তিনিই আত্মা এবং মন তাঁহার আধ্যাত্মিক চক্ষুস্বরূপ। এই মনশ্চক্ষু দ্বারাই আত্মা প্রিয়বস্তুসমূহ দেখেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মা মানসিক ক্রিয়াসমূহের জ্ঞাতা এবং মন, বুদ্ধি ও চিত্ত তাঁহার যন্ত্র মাত্র।

সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত দেবতাগণ বাস করেন তাঁহারা এই আত্মার উপাসনা ও ধ্যান করিয়া থাকেন; তজ্জন্য সমস্ত পৃথিবী ও স্বর্গাদিলোক তাঁহাদের হস্তগত এবং সমস্ত কার্য্য তাঁহাদের আয়ত্তাধীন। যিনি এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার কোন বিষয়ই সেই উচ্চতম সুরলোকস্থ দেবতাবৃন্দের ন্যায় করায়ত্ত হইতে বাকী থাকে না। তিনি দেবতাদিগের ন্যায় ত্রিজগতের প্রভু। তাঁহার কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না; এবং এমন কোনও বাসনা নাই যাহা তাঁহার অপ্রাপ্তব্য হইতে পারে। তিনি বাহ্য জগৎ ও সংসার হইতে কোন প্রকার সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাই তাঁহার মধ্যে থাকে; এক কথায় তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ও আনন্দময় হইয়া বিরাজ করেন।* এইরূপে প্রজাপতি জীবের প্রকৃত স্বরূপ এবং আত্মার গূঢ়তত্ত্ব ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা

* "য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাৎ তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ।" —৮।১২।৬ ছা, উ।

করিয়াছিলেন. এবং পবিত্রচেতা, আগ্রহবান্ ও উপযুক্ত শিষ্য ইন্দ্রও গুরুর আশীর্ব্বাদে প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র একশত একবৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তাঁহার গুরুদেব প্রজাপতির সেবা করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মজ্ঞান লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, আগ্রহ এবং অপ্রতিহত ইচ্ছাই আত্মজ্ঞান লাভের সোপানস্বরূপ।

ইন্দ্র পরমানন্দ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গুরুদেবের চরণ-বন্দনা করিয়া নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের ফল দেবতাগণকে দান করিলেন। তাঁহারাও ইন্দ্রের উপদেশ পালন করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সমস্ত জগতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এইরূপেই আত্মজ্ঞানের শক্তি ও মহিমা ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে।

"ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥"

"ব্রহ্ম আমাদিগকে (গুরু ও শিষ্য উভয়কে) রক্ষা ও প্রতিপালন করুন। গুরু যেন আমাদিগকে আত্মতত্ত্ব বিদ্যা প্রদান করেন এবং আমরাও যেন উপদিষ্ট হইয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারি। আমাদের অধীত বিষয় তেজস্বী হউক্ এবং সেই বিদ্যা সফল হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হউক। এবং আমরা যেন পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ না হই।

—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥"

আত্মসাক্ষাৎকার

বৈদিকযুগে কোন আত্মজ্ঞানানুসন্ধিৎসু তাঁহার জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও দেখিলেন যে, তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না। তিনি সমস্ত দেবতার পূজা ও সেবাতে দিনযাপন করিয়াছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার ত আত্মজ্ঞান লাভ হইল না! জীবনের অধিকাংশ সময় ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এইরূপে যখন তিনি দেখিলেন যে, সুখ, শান্তি ও জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও পার্থিব সম্বন্ধ দ্বারা প্রাপ্ত হইবার নহে এবং এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যজগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য, তখন তিনি পার্থিব ভোগ-সুখাদিতে বীতস্পৃহ হইলেন এবং জাগতিক বস্তু সকলের উপর আসক্তি ত্যাগ করিলেন।

তিনি অধ্যয়নকার্য্যও ত্যাগ করিলেন, কারণ তিনি দেখিলেন যে, শাস্ত্রপাঠের দ্বারা আত্মজ্ঞান কিম্বা অবিছিন্ন সুখ লাভ করা যায় না। পুস্তকাদি ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ উচ্চ হইতে উচ্চতর ব্যবহারিক সত্যসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র। উহারা উচ্চতম সত্যকে আমাদের আয়ত্ত করাইতে পারে না। অনেকেই ভ্রমবশতঃ ধারণা করেন যে, ধর্ম্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিলেই তাঁহারা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল লাভ করিবেন। শাস্ত্রাদির মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঐশ্বরিক প্রেম, মুক্তি এবম্প্রকার

আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের বর্ণনা আছে মাত্র ; কিন্তু যেমন পঞ্জিকার মধ্যে সম্বৎসরের বারিবর্ষণের পরিমাণ লিখিত থাকিলেও উহাকে নিংড়াইলে একবিন্দুও জল পাওয়া যায় না, সেইরূপ শাস্ত্রাদি গ্রন্থসমূহকে মন্থন করিলেও আধ্যাত্মিক সত্যসকলের বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি হয় না। শাস্ত্রসমূহের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে উহাতে বর্ণিত সত্যের উপলব্ধি করিতে হইবে।

উপরি উক্ত কারণে সেই আত্মজ্ঞানানুসন্ধিৎসু পুরুষটি অধ্যয়নাদি ত্যাগ করিয়া একজন আত্মজ্ঞ আচার্য্যের নিকট আত্মজ্ঞান লাভ উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে গমন করিলেন। তাঁহার আর অন্য কোনও প্রকার বাসনা ছিল না। তিনি স্বর্গেও যাইতে চাহেন না, আত্মাকে বিদিত হওয়াই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; ইহা ভিন্ন তিনি অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট বা সুখী হইবেন না। আত্মজ্ঞ পুরুষের চিত্তে জ্ঞানরূপ যে অমৃতধারা প্রবাহিত হয়, তাহাই আস্বাদন করিতে এখন তিনি উৎসুক হইয়াছেন। যদিও তিনি গ্রন্থাদি পাঠে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই স্থূল দেহটিই যথাসর্ব্বস্ব নহে এবং ইন্দ্রিয়ের পরিচালক যে মন তাহা প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং তাহা কখনও অপরিবর্ত্তনশীল আত্মা হইতে পারে না, তথাপি তাঁহার আত্মজ্ঞান পিপাসা বিদূরিত হয় নাই। এক্ষণে তিনি সেই অপরিবর্ত্তনশীল ও নির্ব্বিশেষ সত্যের,—সেই আত্মার আত্মা এবং সমস্ত জগতের একমাত্র শাসনকর্ত্তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অতি ভক্তিভরে গুরুদেবের চরণ-বন্দনা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন—"ভগবন্, কে এই মনকে শাসন করিতেছে? কাহার বাসনাপ্রেরিত হইয়া মন স্ব-বিষয়ে গমন করিতেছে? কাহার শক্তি আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে নিয়মিতভাবে চালাইতেছে? কি কারণে আমরা এইরূপ কার্য্যতৎপর এবং এই কার্য্যতৎপরতার কারণই বা কি? কাহার ইচ্ছায় লোকসকল শব্দোচ্চারণ করিতেছে? এই দৃশ্যসমূহের দর্শনকর্ত্তাই বা কে? কোন্ শক্তি চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলিকে নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে।"*

উপরি উক্ত প্রশ্নগুলি অবলম্বন করিয়া 'কেনোপনিষৎ' আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে লিপিপ্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ভারতীয়-গণের মধ্যে মৌখিকভাবে এই উপনিষদের শিক্ষা পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই উপনিষৎটি কত প্রাচীন এবং ইহার উপদেশাবলীও কত মহান্! সেই পুরাতন যুগের প্রশ্নগুলির ভাবের গভীরতা একবার ভাবিয়া দেখুন। আমরা জানি যে, আমাদের মন সর্ব্বদা চঞ্চল; নূতন ভাব, নূতন চিন্তা মনে উদয় হইতেছে, আবার ক্ষণপরেই উহা লয় হইতেছে। মন অবিরত একস্থান

---

* "কেনেষিতং পতন্তি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥"
—কেনোপনিষৎ ১।১॥

হইতে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছে—ইহা কখনও ভারতবর্ষে, কখনও বিলাতে, আবার কখনও চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র এবং অন্যান্য গ্রহমণ্ডলে ছুটিয়া চলিতেছে। এইজন্যই শিষ্যটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কাহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া মন অবিরাম চঞ্চলভাবে ছুটিয়া বেড়ায়?" ইহার উত্তরে আচার্য্যদেব বলিলেন—"যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, ইন্দ্রিয়যন্ত্রের ক্রিয়াসমূহের পরিচালক এবং দৃষ্টবিষয়ের দর্শনকর্ত্তা, তিনিই উহা করিয়া থাকেন।† এই উত্তরটির অর্থ কি—তাহা এখানে বিশদ্‌ভাবে দেখা যাক্। 'শ্রবণ করা'—এই বাক্যের দ্বারা আমরা কি বুঝিয়া থাকি? যে শক্তির দ্বারা শব্দরূপ ভাবটি আমাদের অন্তরে জাগরিত হয়, তাহাকেই শ্রবণ ব্যাপার বুঝায় বা ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি শব্দকম্পনকে পরিচিত করায় অর্থাৎ কম্পনটির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করায় তাহাকেই শ্রবণ ব্যাপার বলে। সুতরাং যাঁহার সাহায্য ভিন্ন কোনও শব্দই শ্রবণ করা করা যায় না—সেই শ্রবণশক্তির উন্মেষকারী ও উদ্ভাসককে শ্রোত্রের শ্রোত্র বুঝায়। আচার্য্যের উত্তরের তাৎপর্য্য বা ভাবার্থ এই যে, যিনি মনের নিয়োগকর্ত্তা তিনিই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তির উদ্ভাসক বা প্রকাশক এবং তিনিই আমাদের ইন্দ্রিয়-যন্ত্রাদির ক্রিয়াসমূহের জ্ঞাতা।

---

† "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ—"
—কেনোপনিষৎ ১।১॥

নেত্রের নেত্রস্বরূপের অর্থও ঐ প্রকার। ইন্দ্রিয়ের যে কার্য্যদ্বারা দ্রষ্টব্যবস্তু প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ আমাদের নিকট বস্তুটি পরিচিত রূপে প্রকাশ পায়, তাহাকেই দর্শন ব্যাপার বলে। জ্ঞান বা বুদ্ধি উৎপাদন করিতে দর্শনেন্দ্রিয়ের কোনও ক্ষমতা নাই। দর্শনকারী ব্যক্তি যতক্ষণ প্রজ্ঞাচক্ষু থাকেন অর্থাৎ যতক্ষণ তাঁহার 'অহং পশ্যামি' বা 'আমি দর্শন করিতেছি'—এইরূপ জ্ঞানটি থাকে, ততক্ষণই দর্শনশক্তিটি তাঁহাতে জাগ্রত থাকে। দর্শনেন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলি যথা চক্ষু, অক্ষিগোলকের ঝিল্লি (retina) চক্ষুমধ্যস্থ স্নায়ুসমূহ, মস্তিষ্কস্থ ক্ষুদ্র কোষসমূহ (brain cells) ইত্যাদি,—দ্রষ্টব্য বস্তু বা কোনও বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করিতে একেবারেই সক্ষম নহে। একটি মৃত দেহের উপর্য্যুক্ত যন্ত্রগুলি অবিকৃত থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ দেহ কোনও বর্ণ বা কোনও দৃশ্য অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না। দেহটি নিজ প্রভাবে কোনও বাহ্যবস্তু দেখিতে বা তাহা অনুভব করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। এইরূপে আমাদের অনুভূতিগুলির বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির যাবতীয় ক্রিয়াই স্বভাবতঃ সংজ্ঞাহীন। চেতন আত্মা—যিনি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যাদির প্রকাশক, তিনিই দর্শন কর্ত্তা, শ্রবণ কর্ত্তা ও অনুভব কর্ত্তা। ইনিই আমাদের অন্তরের মধ্যে চিন্তারাজির উৎপাদক কর্ত্তারূপে বর্ত্তমান আছেন। সেই জ্ঞান ও চৈতন্যের মূর্ত্তিঘন আত্মাই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও অনুভূতির মূলস্বরূপ এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণের

কার্য্যনিয়ামক। যখনই আমরা প্রজ্ঞা বা আত্মচৈতন্যের কারণকে উপলব্ধি করিতে পারিব, তখনই মন-নিয়ন্ত্রনকারী শক্তিকে আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব।

বেদান্ত দর্শনের মতে মন হইতেছে—"সূক্ষ্মতম জড়-পরমাণুর কম্পনাবস্থা"। এই মনোপাদানের কম্পনই সর্ব্বপ্রকার উপলব্ধি ও অনুভূতি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং যে সকল বস্তু স্থূল জড়-পরমাণুর কম্পন দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না তাহাদিগকে প্রকটিত করে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন অতি সূক্ষ্ম পরমাণু-রাশির কম্পনই মনের স্বরূপ (function)। কিন্তু মনের ঐ উপাদানের কম্পনের দ্বারাও জ্ঞান বা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। ইহা স্বভাবতঃই সংজ্ঞাহীন বা অচেতন। একখণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখিলে উহা যেরূপ ঐ অগ্নির তুল্য লোহিত বর্ণ ও তাহার দাহিকাশক্তি-বিশিষ্ট হয়, সেরূপ মন পদার্থও আত্মার সংস্পর্শে আসিলে প্রজ্ঞাযুক্ত স্বরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রজ্ঞান-ঘন আত্মা যেন চুম্বকের মত মনরূপী লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যখন একখণ্ড লৌহকে চুম্বকের নিকট রাখা যায়, তখন লৌহখণ্ডটি তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নড়িতে থাকে; কিন্তু বাস্তবিক লৌহের নিজের উক্ত প্রকারে চলিবার ক্ষমতা নাই। উহা চুম্বকের নিকট অবস্থান করিলে বা উহার সংস্পর্শে আসিলে আকৃষ্ট হইয়াই গতিশীল ধর্ম্ম দেখাইয়া থাকে। চুম্বকের সান্নিধ্যই যেমন লৌহখণ্ডটির মধ্যে গতিশীলতা আনয়ন করে, আত্মার সান্নিধ্যই সেই প্রকারে মনোরূপ বস্তুটিকে

ক্রিয়াশীল করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মা মনোরাজ্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। কারণ তিনি দেশ ও কালের সম্বন্ধাতীত।

আচার্য্যদেব বলিতে লাগিলেন—এই আত্মাকে বিদিত হইয়া সুধীগণ পার্থিব বাসনাদি হইতে মুক্তি লাভ করতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূলস্বরূপ সেই আত্মাকে জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যু নাই। কিন্তু যাঁহারা আত্মাকে জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা স্থূল দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য জন্মমৃত্যুরও অধীন হইয়া থাকেন। আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মাকে জানিতে পারিলে আমরা অমৃতত্ব লাভ করি—ইহা আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন ফলের মধ্যে অন্যতম একটি ফল। যদিও বেদান্তদর্শন মতে আত্মার মৃত্যু নাই এবং অমরত্বই আমাদের জন্মগত অধিকার; তথাপি যতদিন না অবিনাশী আত্মাকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি ততদিন আমাদের ঐ অমৃতত্ব লাভ হয় না। "আমরা বিনাশশীল"—এই কথা যতদিন চিন্তা করিব, ততদিন আমরা মৃত্যুর অধীন থাকিব। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত ভয় চলিয়া যায়। অজ্ঞানবশতঃ আমাদের মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্যই আমরা যে, অমৃতের সন্তান ও মৃত্যুরহিত—এই কথা ভুলিয়া যাই, আর সঙ্গে সঙ্গে 'আমরা দেহ ছাড়া আর কিছু নহি'—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ি। এইরূপ বিনাশশীল স্থূল দেহটির

সহিত একীভূত হইয়া বা দেহের সহিত নিজেকে এক ভাবিয়া মৃত্যুকে ভয় করিতে থাকি এবং দুঃখে ও নৈরাশ্যে কাতর হইয়া পড়ি। আত্মাকে নশ্বর দেহের সহিত এক বোধ করিলে কিরূপে মৃত্যুভয় হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি? 'জড় দেহটি—এই আত্মার ক্ষণিক আবাসস্থল বা আধার',—এই ভাবটি যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে আর মৃত্যুভয়ে কাতর হইতে হয় না। আত্মাই কতকগুলি বাসনা ও উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য এই দেহযন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন—যিনি এই মহান্ সত্যটি যথাযথ ভাবে জানিয়াছেন, তিনিই ভয়কে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। এই কারণে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যাঁহারা (আপনাদের) যথার্থ স্বরূপের বা আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিকেই জ্ঞানী বলা যায় এবং দেহটি ধ্বংস হইলে তাঁহারা জন্মমৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান।"* এই আপেক্ষিক জগতে ইহাই এক মাত্র প্রাপ্য বস্তু।

এই জগতে কোন একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে আমরা আসিয়াছি। এখন আমরা মনে করিতেছি যে, বিষয় সম্পত্তি ভোগ, ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ, বাসনাচরিতার্থ ও ইন্দ্রিয় ভোগই এই জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু একটি সময় অবশ্যই আসিবে, যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, এবং

* "—অতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"
—কেনোপনিষৎ ১।২॥

প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা আরও মহৎ এবং চিরস্থায়ী। জীবনের আসল উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন; কারণ মানবজীবনের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে কিনা— বুঝিবার মাপকাটি এই পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই স্থির করিতে পারে। আমাদের প্রত্যেককেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যটি কি তাহা বিচার পূর্ব্বক স্থির করিতে হইবে, এবং তাহা আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আত্মজ্ঞান চিত্তে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাব আনয়ন করে। এই আত্মজ্ঞান দ্বারাই আমরা একমাত্র সমস্ত কাম্য বস্তু বা বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারি। মানবের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মার জ্ঞানলাভ অপেক্ষা এই জগতে উচ্চতর বস্তু আর নাই। এখন আমাদের যে প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা অসম্পূর্ণ এবং ইহা সেই সর্ব্বজ্ঞ নির্ম্মল স্বভাব আত্মার আংশিক প্রকাশ মাত্র। নানাবিধ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া আমাদের বুদ্ধি সেই দিব্য (Divine) জ্ঞানকে প্রতিফলিত করে বলিয়াই উপরি উক্ত অসম্পূর্ণতারূপ ত্রুটী আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু যখনই সর্ব্বপ্রকার বাধা চলিয়া যায় এবং বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, তখনই যথার্থ জ্ঞান আমাদের অন্তরের মধ্যে সমুদিত হয়। "একটি দর্পণ ধূলি সমাচ্ছন্ন হইলে, তাহাতে যেরূপ সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হয় না, বুদ্ধিরূপ দর্পণও তদ্রূপ সংসার-বাসনারূপ ধূলিজালে সমাবৃত হইলে আত্মারূপ জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মি তাহাতে প্রতিভাসিত হয় না। চিত্তশুদ্ধি করিবার উপায় জানিতে ও উক্ত সত্য শিক্ষা করিতে

হইলে, আমাদের একজন তত্ত্বজ্ঞ গুরুর সাহায্য প্রয়োজন হয়। জ্ঞান বা প্রজ্ঞা এক ভিন্ন বস্তু নহে, এবং যে জ্ঞান আমাদের আছে, উহাই যখন অমরাত্মার দর্শন করাইয়া দিবে, তখন সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপে গণ্য হইবে। অতএব যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই জীবনেই অমৃতত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যিনি মনের পরিচালক, দৃশ্যের দর্শনকর্ত্তা এবং যাঁহাকে জানিয়া লোকে অমৃতত্ব লাভ করে সেই আত্মার দর্শন লাভ করিতে শিষ্যটি ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে তাঁহার গুরুদেব বলিলেন, 'দর্শন-শক্তির' ত আত্মাকে প্রকাশ করিবার কোনও ক্ষমতা নাই।" *

তখন শিষ্যটি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যদি চক্ষুর আত্মদর্শন করাইবার ক্ষমতা না থাকে, অন্ততঃ আত্মা কিরূপ, তাহার বর্ণনা করা যাইতে ত পারে।" আচার্য্যদেব উত্তর করিলেন, "বাক্য তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে অক্ষম; মনও সেখানে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ আত্মার রাজ্যে মন যাইতেই পারে না; যখন আমরা তাঁহাকে মন ও বুদ্ধি যোগে জানিতে পারি না তখন কি প্রকারে তাঁহার বিষয় বাক্যের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে?" † চিন্তা সমূহের চিন্তা-কর্ত্তাই আত্মা। চিন্তা রাজ্যের অতীত যে আত্মা তাঁহারই দ্বারা

---

* "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি—" কেন ১।৩ ॥

† "যন্মনসা ন মনুতে—" কেন ১।৬ ॥

পরিচালিত হইলে মন চিন্তা করিতে পারে। 'চিন্তা' কার্য্যটি অগ্রেই প্রজ্ঞার অস্তিত্ব স্বীকার করে ; এবং প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন প্রকার চিন্তাই কাহারও অন্তরে উদয়ই হইতে পারে না। সুতরাং যাহা সর্ব্বপ্রকার চিন্তার বহিঃ সীমায় ও অতীত প্রদেশে আছে তাহাকে মন ও বুদ্ধি কিছুতেই ধরিতে পারে না। * যখন মনই এই আত্মার বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, তখন চক্ষু কি প্রকারে এই আত্মাকে দেখিতে পাইবে ? যাহার সংস্পর্শে আসিবার পরে দৃষ্টিশক্তির দর্শন করাইবার ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহাকে দৃষ্টিশক্তি কিরূপে দেখাইতে পারিবে? ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। আচার্য্যদেব বলিলেন, "ইহা জ্ঞাত বস্তু হইতে বহু দূরে এবং অজ্ঞাত বস্তুরও বহু ঊর্দ্ধে—এই উপদেশ আমরা সেই প্রাচীন আচার্য্যবৃন্দের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।" † অতি প্রাচীনকাল হইতে সত্যদর্শী ঋষিগণ বলিয়া আসিতেছেন যে, আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মা যেমন জ্ঞাত বা জ্ঞাতব্য নহেন, সেইরূপ ইনি আবার অজ্ঞাত বা অজ্ঞাতব্যও নহেন। সাধারণতঃ আমরা ব্যবহারিক জগতে "এই বস্তুটি জানি" বা "এই পুস্তক সম্বন্ধে জ্ঞান আছে" এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকি ; কিন্তু এই প্রকার জ্ঞানের মত আত্মা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান হইতে পারে না।

---

* "——ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।" কেন ১।৩ ॥

† অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ কেন ১।৪ ॥

অর্থাৎ আত্মা এইরূপে জ্ঞাত হ'ন না অথবা আত্মা উক্ত পুস্তকটির মত জ্ঞাতব্য বিষয়ও হইতে পারেন না।

উপরি উক্ত বিষয়টি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যখন আমরা বলি যে, 'অমুক বস্তুটি 'আমি জানি' তখন ঐ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশিত আপেক্ষিক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে অর্থাৎ আমার ঐ বুদ্ধির সাহায্যে আমি ঐ বস্তুটিকে জানিতে পারিলাম।—আবার ইহাও হইতে পারে যে, যে বুদ্ধি দিয়া আমি পূর্ব্বে ঐ প্রকার বস্তু জানিতে পারিয়াছিলাম উহা সেই এক প্রকার বস্তু বলিয়াই এখনও সেই বুদ্ধি দিয়া উহাকে আবার জানিতে পারিলাম—এইরূপ জ্ঞানকেই আপেক্ষিক জ্ঞান বলে। আবার যখন বলি যে 'অমুক বস্তুটি জানি না' তখনও ঐ না-জানিতে পারা জ্ঞানটিও বুদ্ধির আপেক্ষিক জ্ঞান। তাহার পর, আবার যে সমস্ত বস্তুর ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে বা যাহারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহাদেরই আমরা বুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারি। এই বুদ্ধি কোন-না-কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির অধীন। সুতরাং ইহার ক্ষেত্রও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কারণ ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি একটি বৃত্তের মধ্যে অধিষ্ঠিত মনে করি এবং উহাদের শক্তিগুলি যদি ঐ বৃত্তের পরিধি মনে করি এবং উহাদের শক্তি-গুলি যদি ঐ বৃত্তের পরিধি অতিক্রম করিয়া না যাইতে পারে তাহা হইলে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে,

অতি ক্ষুদ্র—কারণ ইন্দ্রিয়-শক্তির রাজ্যের সীমা অতি

ক্ষুদ্র। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিয়া দেখা যাউক। আমরা কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করি। বায়ুর কম্পনটি মাত্রান্তর্গত হইলেই শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। আর যদি ঐ কম্পন মাত্রা-বিশেষের বেশী বা কম হয় তাহা হইলে কোনও শব্দই শুনিতে পাওয়া যাইবে না। এমন কি যদি ভীষণ একটি শব্দ হয় তাহা হইলেও মাত্রা দুইটির মধ্যে উক্ত শব্দের কম্পনের সংখ্যা না থাকিলে আমাদের কর্ণ ঐ শব্দ শ্রবণ করিবে না। চক্ষু সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়া থাকে। কোন বস্তু বিশেষ দুইটি সীমার মধ্যে অবস্থান করিলেই উহা দর্শন করিতে পারা যায়। তাহা হইলে এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের বুদ্ধিটি ইন্দ্রিয়-শক্তি-গুলির অধীন হইয়া কত সীমাবদ্ধ; সুতরাং ইহা বলিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা গৌণ জ্ঞান। ইহা আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, "আত্মা জ্ঞাত বস্তু হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।" আবার যখন আমরা বলি যে, 'এই বস্তুটি জানি না', তখন ঐ কথার দ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে, আমাদের ঐ বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞতার জ্ঞানটিই আছে; অর্থাৎ আমরা ঐ বস্তুটিকে বুঝিতে পারি না বা বুদ্ধির দ্বারা উহাকে জানিতে পারি না—এই জ্ঞানটিই আমাদের আছে। বুদ্ধির দ্বারা কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞতা বলে—ইহাকেই গৌণ জ্ঞান বলিয়াছি। ইহা প্রজ্ঞা বা যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর নির্ভর করে না সেই জ্ঞানের দ্বারাই ইহা প্রকাশিত হয়।

আমরা 'অমুক বস্তুটি' জানি না' এই জ্ঞানটি আত্মা হইতেই আসিয়া থাকে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, আত্মা জ্ঞাতও নহেন বা অজ্ঞাতও নহেন। এই আত্মা কিন্তু অজ্ঞতা এবং আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত প্রদেশে অবস্থান করেন। "আমাদের পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের নিকট ইহাই শুনিয়াছি।"* যদিও এই কেনোপনিষৎ সামবেদান্তর্গত এবং অতি প্রাচীন তথাপি যে সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যদর্শী ঋষির নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে ঐ সত্যের শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে, সেই মহাপুরুষগণকে উল্লেখ করিয়াই আচার্য্যদেব উপরি উক্ত কথাটি বলিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ আচার্য্যদেব আবার বলিলেন, "বাক্যের দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, বরং যাঁহার সাহায্যেই বাক্য সমূহ উচ্চারিত হয় তিনিই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; সাধারণ লোকে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"† বস্তুতঃ ঈশ্বরে আমরা যে সমস্ত গুণ আরোপ করি তাহা তাঁহার যথাযথ গুণ নহে। যেমন আমরা বলি ঈশ্বর সদ্‌গুণসম্পন্ন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ত কেবল সদ্‌গুণসম্পন্ন নহেন—তিনি সদ্‌গুণ ও অসদ্‌গুণ উভয়েরই অতীত। আমার

---

* "ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে॥"

—কেন ১।৩॥

† যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—কেনোপনিষৎ ১।৪॥

মনে সদ্‌গুণ ও অসদ্‌গুণ উভয়েরই পার্থক্য বিচার করিয়া সদ্‌গুণকে অসদ্‌গুণ হইতে পৃথক্ করি, এবং তাহার পর ঐ সদ্‌গুণের আকারটিকে মনের মধ্যেই বর্দ্ধিত করিয়া সেই অনন্তে আরোপ করি এবং বলিয়া থাকি যে, তিনি সদ্‌গুণসম্পন্ন। আমরা ভুলিয়া যাই যে, যাঁহাকে আমরা উৎকৃষ্ট বলিতেছি তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু আছে—আবার সেই উৎকৃষ্টতর অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ অবস্থা হইতে পারে, যাহা নাকি উৎকৃষ্টতম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, আমরা এত নির্ব্বোধ যে, ঈশ্বরকে উত্তম বা উৎকৃষ্ট আখ্যা দিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি। ভাল-মন্দ এই কথাগুলি আপেক্ষিক এবং সীমাবদ্ধ—ঈশ্বর আপেক্ষিক রাজ্যের অতীত প্রদেশে; সুতরাং তিনি আমাদের প্রদত্ত "উৎকৃষ্ট" আখ্যারও বহিঃপ্রদেশে। এই প্রকারে ইহা দেখান যাইতে পারে যে, যে সমস্ত গুণ বা বিশেষণ আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োগ করি, শুধু তাহাই বা কেন, প্রত্যেক বাক্যটি যাহা আমরা উচ্চারণ করি, তাহাদের ভাব ও অর্থ সীমাবদ্ধ। যদি আমরা আরও তলাইয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, প্রজ্ঞাযুক্ত চিন্তাকর্ত্তা ও বক্তা পশ্চাতে না থাকিলে কোন প্রকার চিন্তাও করা যায় না, বা কোন বাক্যও উচ্চারণ করা যায় না। এই প্রজ্ঞা সেই জ্ঞানময় আত্মা হইতে প্রকাশিত হয়। সুতরাং আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু এবং ইহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এই আত্মাই বাক্যের উৎপাদক অথচ বাক্যের দ্বারা এই আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না।

ভক্তগণ যে সগুণ ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাই কি আত্মা? অনেকে বলেন যে, এক মহান্ পুরুষ আমাদের জগতের বহিঃপ্রদেশে স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহারই ইচ্ছা ও আদেশক্রমে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি পরিচালিত হইতেছে—সেই বিরাট্ পুরুষই কি আত্মা? অথবা যাঁহাকে আমরা জগৎপিতা বা আল্লা ইত্যাদি নামে পূজোপহার দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকি, তিনিই কি আত্মা? যাঁহাকে আমরা স্বর্গীয় দেবতা, বলিয়া থাকি, তিনিই কি আত্মা? আত্মা কোন্ বস্তু? শিষ্যের উক্তপ্রকার মানসিক প্রশ্ন সমূহ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গুরুদেব বলিলেন,—"লোকে যাঁহার আরাধনা করে, তিনি ব্রহ্ম বা আত্মা নহেন।" নাম-রূপধারী সাকার ঈশ্বরের যিনি আরাধনা করেন তিনি সেই নির্ব্বিশেষ সত্যের বা ব্রহ্মের আরাধনা করেন না, কারণ তিনি সগুণ ও সাকার ঈশ্বরকেই পূজা করিতেছেন। নাম ও রূপ এই দুইটি প্রাকৃতিক। সুতরাং এই দুইটি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহাকে আমরা নাম-রূপধারীরূপে কল্পনা করি। এইরূপ কল্পনা মানব-মনের সৃষ্টি। সেই জন্য উহা দোষযুক্ত অর্থাৎ আমরা আমাদের কল্পনার সাহায্যে ঈশ্বরের একটি সাকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি এবং তাঁহাতে আমাদের আদর্শ-ভাবানুযায়ী বিভিন্নগুণ আরোপ করিয়া প্রার্থনাদির দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি। প্রার্থনা-গুলি মনোগতভাববিশিষ্ট বাক্যসমষ্টি মাত্র। আমরা সেই সগুণ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঐ বাক্যগুলি (প্রার্থনা সমূহ) বিশেষ কোনও

ফল লাভের জন্য উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহার নিকট আমরা এবম্প্রকার প্রার্থনা করি তিনি আমাদের বাক্‌শক্তির নিয়ামক নহেন। যাঁহার সাহায্যে আমাদের বাক্‌শক্তি পরিচালিত হয় তিনি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। সেই 'আত্মা' এই পূজিত সগুণ ঈশ্বর হইতে পৃথক্। বস্তুতঃ নাম-রূপধারী সগুণ ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন। ইহা আমাদের নিকট আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতে পারে। তথাপি আমাদের উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে ঈশ্বরের নাম এবং রূপ আছে এবং যাঁহাকে বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে এবং মন দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করা যাইতে পারে, তিনি কখনই সেই ব্রহ্ম নহেন। শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, "যখন ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াছি বলা যায়, তখন তিনি আর ব্রহ্ম নহেন; যাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া গেল তিনি আমাদের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহেন।"* যাঁহাকে পূজা করা যায় সেই সগুণ দেবতা হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক্।

যাঁহাকে আবার মনের দ্বারা চিন্তা করিতে পারা যায় তিনিও ব্রহ্ম নহেন। তজ্জন্য ঐ আচার্য্য বলিয়াছেন, "যিনি মনের অগোচর এবং মনের দ্রষ্টা তাঁহাকেই তোমার আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কিন্তু লোকে যাঁহার আরাধনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"† "চক্ষুর

* "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"।

† যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥—কেনোপনিষৎ ১। ৫ ॥

দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায় না, কিন্তু যাঁহার সাহায্যে চক্ষু দর্শন করিয়া থাকে তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু লোকে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"* "কর্ণ দ্বারা যাহা শ্রবণ করিতে পারা যায় না, বরং কর্ণই যাঁহার দ্বারা শব্দাদি শ্রবণ করে তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাঁহাকে লোকে পূজা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"† "লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, বরং যাঁহার সাহায্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আঘ্রাণ করিতে সমর্থ হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু সাধারণতঃ যিনি উপাসিত হ'ন তিনি ব্রহ্ম নহেন।"‡ উপরি উক্ত শ্লোকার্থ সকল হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মন এবং ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক আত্মা ও সগুণ ঈশ্বর এক নহে; কিন্তু আত্মা ও ব্রহ্ম এক।

গুরুদেবের নিকট আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্যটি সেই বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা বা ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার জন্য নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গেলেন।

---

* যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥—কেনোপনিষৎ ১।৬॥

† যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥—কেনোপনিষৎ ১।৭॥

‡ যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥—কেনোপনিষৎ ১।৮॥

তিনি কিছুকাল সমাধি অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন এবং আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণ জ্ঞান রাজ্যে আবার মনকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার গুরুদেবের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি ও সেই পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া তাঁহার গুরুদেব বলিলেন—"তুমি যদি মনে কর যে, তুমি আত্মাকে জানিয়াছ, তাহা হইলে স্থির জানিও যে, তুমি আত্মার স্বরূপ অতি অল্পই জ্ঞাত হইয়াছ।"* যদি তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে যে, তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়াছ তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তোমার ও নিখিল বিশ্বের অন্তর্গত সেই সত্য স্বরূপের অতি সামান্যই তুমি ধারণা করিয়াছ। 'সত্য' এক, উহা একের অধিক নহে। এই সত্যকে জানিয়াছ এইরূপ যদি তোমার মনে হয়, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে যে, তুমি বুদ্ধি দ্বারা তোমার গৌণ জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই এইরূপ উক্তি করিয়াছ; ইহা নিশ্চয় জানিও যে, গৌণ জ্ঞানের দ্বারা সেই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ কখনই প্রকাশ হইতে পারে না। তুমি ব্রহ্মকে বা আত্মাকে জানিয়াছ ইহা যদি অন্তরে চিন্তা কর তাহা হইলে মনের পরিচালক সেই আত্মার তুমি

* যদি মন্যসে সুবেদেতি দহরমেবাপি নূনম্। ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
—কেনোপনিষৎ ২।১।১

অল্পই জানিয়াছ। আর তিনি তোমার দেহের মধ্যে বাস করিতেছেন, এইরূপ যদি মনে কর, তাহা হইলে তাঁহার নির্গুণত্ব তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই। আবার তিনি তোমার দেহের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন এইরূপ ভাবেই যদি তুমি তাঁহাকে জানিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সেই পরম সত্যের কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। তুমি যদি সেই আত্মা বা ব্রহ্মকে ঈশ্বর বা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা রূপেই জানিয়া থাক, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার অতি অল্পই বুঝিতে পারিয়াছ।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি আমাদের দেহের মধ্যেই আত্মা বাস করিতেছেন এইরূপ উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে কি করিয়া তাঁহার বিষয় অতি অল্পই জানা হইবে? বাস্তবিকই ঐ অবস্থায় আত্মাকে অতি অল্পই জানা হইল, কারণ যিনি মনের পরিচালক তিনি ত আর একটি মাত্র স্থানেই আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। আত্মার ব্যাপ্তি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; ইনি দেশ সম্বন্ধাতীত সুতরাং তিনি কেবল একটি স্থানেই আছেন আর অপর স্থানে নাই এই জ্ঞানের দ্বারা সেই পরম সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না। আবার যদি আমরা মনে করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে নাই, কিন্তু আমাদের বহিঃপ্রদেশে আছেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব এবং দেশকালাতীত্ব ধর্ম্মটা দেখিতে পাই না। আমরা এখানে মাত্র অনন্তের কিয়দংশ যাহা দেশ কালের মধ্যে এবং উহাদের সম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহাই জানিয়াছি।

উক্ত প্রকার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া সেই আত্মানুসন্ধিৎসু শিষ্য পুনরায় উপযুক্ত স্থানে আসন করিয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তিনি চিন্তার রাজ্য ছাড়াইয়া সমাধি অবস্থায় পৌঁছিলেন। কিয়ৎকাল নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় থাকিবার পরে তিনি আবার মন ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি আত্মা বা ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে বিদিত হইয়াছি বলিয়া মনে করি না, আবার তাঁহাকে যে, একেবারেই জানি নাই এই কথাও বলিতে পারি না। আত্মা জ্ঞাত হইবার নহে বলিয়াই যে, মনে করিতে হইবে আত্মা একেবারেই অজ্ঞাত এমন নহে ; যিনি এবম্প্রকার সত্য জানিয়াছেন তিনিই সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন।" * তাঁহার উক্ত প্রকার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, আত্মজ্ঞান অজ্ঞান ও আপেক্ষিক জ্ঞানের অন্তর্গত নহে—ইহা উহাদের অতীত জ্ঞান। আমরা বিচার বুদ্ধির দ্বারা যাহা কিছু জানিয়া থাকি তাহা সেই আত্মা হইতে নিষ্ক্রান্ত জ্ঞানালোকের সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। আত্মার জ্ঞাতা আর কেহ নাই যিনি মন ও চিন্তা সমূহকে আলোক দান করিতে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ আত্মাই একমাত্র নিত্য জ্ঞাতা পুরুষ। এই বিশ্বজগতে এমন কিছু নাই যাহা আত্মার জ্ঞাতা ; তথাপি এই আত্মাই আমাদের সমস্ত জ্ঞানের আকর অর্থাৎ যত

---

* "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"—কেনোপনিষৎ ২।১০।২॥

প্রকার জ্ঞান আছে তাহা আত্মা হইতেই সম্ভূত। এই আত্মা সর্ব্বদাই জ্ঞাতা অর্থাৎ বিষয়ী ভাবে অবস্থিত—ইনি কখনও জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় নহেন। ঐ জিজ্ঞাসু আরও বলিলেন, "যিনি মনে করেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না, তিনিই যথার্থ তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি' তিনি ব্রহ্মকে যথার্থ বুঝিতে পারেন নাই। ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন নাই; কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, ইনি কখনই জ্ঞাত হইতে পারেন না, তাঁহারাই ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছেন।" †

উপরি লিখিত উক্তি যেন একটি প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী; উহার অর্থ কি হইতে পারে? যদি আমরা আমাদের অনুভূতি-গুলি বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? মনে করা যা'ক যে, আমরা কোনও একটি রূপ দর্শন করিতেছি; বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই জানি যে, আকাশের অর্থাৎ "ইথার" নামক পদার্থের বিশেষ এক প্রকার কম্পনের দ্বারা আলোক রশ্মি উৎপন্ন হয় এবং রূপের অনুভূতিটি ঐ আলোকের সাহায্যেই হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু মধ্যস্থ ঝিল্লীতে আলোক রশ্মি পতিত হইলে উহার মধ্যে এক প্রকার আণবিক

---

† "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥"—কেনোপনিষৎ ২।১১।৩॥

কম্পন ও পরিবর্ত্তন হয় এবং উহা চক্ষুমধ্যস্থ স্নায়ু মণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কস্থ ক্ষুদ্র কোষগুলিতে প্রেরিত হইলে উহাতেও একরূপ আণবিক কম্পন উত্থিত হয়। তারপর ঐ কম্পনগুলিকে অনুভূতিতে পরিণত করিতে অর্থাৎ উহা যে একপ্রকার অনুভূতি তাহার পরিচয় দিতে একজন চৈতন্য সংযুক্ত 'অহং বা আমি' থাকা প্রয়োজন—এই পরিচয় দেওয়া ব্যাপার শেষ হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, একটি রূপ দেখিতেছি। যদি উক্ত 'অহং' না থাকে, তাহা হইলে কম্পনগুলি মস্তিষ্কস্থ বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহে যাইয়া অন্যান্য প্রকার পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিতে পারে, কিন্তু তখন আর আমাদের ঐ 'রূপ' সম্বন্ধে কোনও প্রকার অনুভূতি হয় না। যেমন একটি দৃশ্যের উপর আমাদের দৃষ্টি থাকিলেও যদি হঠাৎ আমাদের মন অন্য একটি বস্তুর বা বিষয়ের উপর আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত দৃশ্যটি চক্ষুর সম্মুখে থাকিলেও আমরা উহা দেখিতে পাইব না। এখানে আলোক কম্পন মস্তিষ্কস্থ বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহে গিয়াছে এবং যথাযথ ভাবে আণবিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও অনুভূতির নিমিত্ত শারীরিক অন্যান্য সর্ত্ত পূরণ হইয়াছে, তথাপি 'অহং' বা জ্ঞাতা বিদ্যমান না থাকায় দৃশ্যের অনুভূতি হইল না। কম্পনগুলির অর্থ বুঝাইবার জন্য সেই চৈতন্য সংযুক্ত 'আমি বা অহং' তখন অন্য কোনও বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করিয়া আছেন। কিন্তু যখনই এই 'অহং' উপরি উক্ত পরিবর্ত্তনগুলি বুঝাইয়া দেয় তখনই আমাদের অনুভূতি হয়। এই ব্যাপারটি আরও

গভীরভাবে অনুধাবন করা যাউক্। আমাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির পশ্চাতে 'অহং বা আমি' প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। এই 'অহং' যদি প্রজ্ঞাহীন হয় অর্থাৎ যদি 'আমি, আমার', এই জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে আলোক-কম্পনরাশি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে এবং আমাদের মনের মধ্যে কোনরূপ অনুভূতি উৎপাদন না করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে। আবার যদি মন অনুভূতি ও বুদ্ধির মূল হইতে পৃথক্ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে চৈতন্য সংযুক্ত 'আমি'র সহিত কোনরূপ সংস্পর্শে না আসিয়া অনুভূতিগুলি মনের সুপ্ত স্তরে থাকিয়া যাইবে। যিনি এই অনুভূতিরূপ জ্ঞানের মূলদেশে অবস্থিত তিনিই আমাদের প্রকৃত আত্মা।

যখন আমরা বসিয়া থাকি তখন আমরা জানি যে, আমরা বসিয়া আছি; যখন আমরা ভ্রমণ করি তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা ভ্রমণ করিতেছি; যখন আমরা কোনও কার্য্য করি তখন আমাদের জ্ঞান থাকে যে, আমরা ঐ কার্য্য করিতেছি; যিনি এই প্রকার সকল কার্য্যের বা চিন্তার জ্ঞাতা তিনিই হইতেছেন যন্ত্রী বা সর্ব্ববিষয়ের পরিচালক। উক্ত প্রকার জ্ঞান কি আমাদের আত্মা হইতে বিভিন্ন অন্য কোনও প্রকার জ্ঞান? তাহা নহে। উহা আত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে অবিচ্ছেদ্য। আমাদের আত্মা যেন একটি জ্ঞান-সমুদ্র বিশেষ। কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা হইতে জ্ঞান উদ্ভূত হয় অর্থাৎ যাহা হইতে জ্ঞানরাশি প্রবাহিত হয় তাহাই আত্মা;

উহা দ্বারা এই বোধ হয় যে, আত্মা জ্ঞান হইতে পৃথক্ এবং ইহার সহিত এই প্রশ্ন আসে যে, তাহা হইলে আত্মার স্বভাব বা ধর্ম্ম কি ? বেদান্তের অদ্বৈতমতে 'আত্মা' একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বা একমাত্র অখণ্ড সংবিদ্ স্বরূপ (absolute intelligence) এবং উহা অপরিবর্ত্তনশীল। মন ও বুদ্ধির বৃত্তিগুলির অবিরাম পরিবর্ত্তন চলিতেছে কিন্তু আত্মজ্ঞান অপরিবর্ত্তনশীল। আমাদের হৃদয়ে যখন একটি ভাবের উদয় হয় তখন আমরা উহা বুঝিতে পারি এবং অনুভব করি যে, ভাবটি উঠিয়াছে ; আবার যখন ঐ ভাবটি অন্তর্হিত হয় এবং সেই স্থানে অপর একটি ভাবের উদয় হয় তখনও আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ব্বস্থানটিতে একটি নূতন ভাব অধিকার করিয়াছে। যে জ্ঞানবিশেষের দ্বারা আমরা প্রত্যেক নূতন ভাবকে ধরিতে পারি তাহা অন্য কোন প্রকার জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয় না, কারণ এই জগতে কেবল একটি প্রকারই জ্ঞান আছে ; সুতরাং ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও অন্য কোন জ্ঞান দিয়া জানিতে পারা যায় না। যাঁহার দ্বারা আমরা একটি ভাবের বা একটি অনুভূতির অস্তিত্ব জানিতে পারি তাঁহাকে বুদ্ধি বিচার বা অন্য কোনও মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারা ব্যাপারটি ইহারই উপর নির্ভর করে। যখনই আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনও বিষয় বুঝিতে পারি তখনই বুঝিতে হইবে যে, উহা মনবুদ্ধির পরিচালক একমাত্র নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার আংশিক প্রকাশ মাত্র।

সর্ব্বজ্ঞতাই আত্মার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বিষয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধের উপর একেবারেই নির্ভর করে না। বস্তুতঃ সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইলেও এই নিত্য জ্ঞান-স্বরূপের কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না। সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যের সহিত তুলনা করিলে ব্যাপারটি সহজবোধ্য হয়। সূর্য্য যেমন নিজের আলোকে আলোকিত হ'ন এবং অন্য পদার্থকেও আলোকিত করেন, সেইরূপ আত্মাও নিজের জ্যোতিতে নিজে উদ্ভাসিত এবং তৎসঙ্গে তিনি সমস্ত বাহ্যজগতকেও উদ্ভাসিত করেন। সূর্য্য সমস্ত পদার্থকে আলোক দান করেন এবং সেই সঙ্গে স্বয়ংও আলোকিত হ'ন—সূর্য্যকে দেখিবার জন্য কোনও দীপ প্রজ্বলিত করিবার প্রয়োজন হয় না; এই জন্য সূর্য্যকে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়; যাহা স্বয়ংপ্রকাশ তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অপর আলোকের সাহায্যের কি আবশ্যক? এই কারণেই আত্মাকে জ্ঞানসূর্য্য বলা হইয়া থাকে। যে জ্ঞান দ্বারা আমরা সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি এবং ভাব বুঝিতে পারি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইয়া থাকি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা মনোবৃত্তির ও চন্দ্রসূর্য্যাদির কার্য্যসমূহ জানিতে পারি, এবং যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের শরীরস্থ যন্ত্রাদির ক্রিয়াসমূহ বুঝিতে পারি তাহা সেই প্রজ্ঞা বা সংবিদের আকর স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার আলোক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই স্বয়ং-প্রকাশ আত্মাই সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞাতা পুরুষ এবং ইনিই মন ও ইন্দ্রিয়াদির এক মাত্র পরিচালক ও নিয়ামক। এই আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কোনও কার্য্যই করিতে পারিবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "সূক্ষ্মতর জড়তন্মাত্রার কম্পন বিশেষকে মন বলে।" বেদান্ত দর্শনানুসারে আত্মা এবং মন এক নহে। মনের উপাদান তন্মাত্রার কম্পনরাশির মধ্যে চৈতন্যের ভাব নাই; এই মন সংবিদের উৎস নহে অর্থাৎ জ্ঞান মনঃপ্রসূত নহে। মনের যাবতীয় ক্রিয়া রহিত হইয়া যাইলেও আমাদের 'অহং' জ্ঞানটি থাকিবে। সমাধি অবস্থায় কাহারও ভয়, ক্রোধ বা মনের অন্যান্য বৃত্তি সমূহ যথা প্রবৃত্তি, বাসনা, উচ্ছ্বাস, ইচ্ছা, সঙ্কল্প বিকল্প, নিশ্চয়, অনুভব ইত্যাদি না থাকিলেও তাঁহার প্রজ্ঞা চলিয়া যায় না, বা সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হ'ন না। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মা মনোরাজ্যের কার্য্যাদি হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র।

সমাধি অবস্থায় উপনীত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি ও মন এবং ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যচক্র বন্ধ করা যাইতে পারে অর্থাৎ এই সময়ে দেহ ও মনের সংস্রব না রাখিয়া সমাধিস্থ পুরুষ মন ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্য অতিক্রম করিয়া উহা অপেক্ষা উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদের কখনও সমাধি হয় নাই তাঁহাদের পক্ষে এই সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। বুদ্ধিপ্রসূত বিবেকজ্ঞান দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হ'ন না। এই

আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তার রাজ্য ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইবার উপায় শিক্ষা করিতে হইবে। বুদ্ধির দ্বারা আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহা আপেক্ষিক এবং অসম্পূর্ণ; সুতরাং আমাদের বিচার-বুদ্ধি পরিদৃশ্যমান এই বাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া সেই অসীমের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম নহে। তজ্জন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে, "যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন ভাবেন, তিনি আত্মাকে একেবারেই জানেন নাই।"

ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যে কল্পনা করিয়া থাকি সেই সমস্ত ধারণা হইতে আত্মজ্ঞান বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করে; কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণাসমূহ আমাদের মনের মধ্যেই হইয়া থাকে; কিন্তু যদি মন প্রজ্ঞা হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে ঐ ধারণা লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের ভিতর প্রজ্ঞা আছে বলিয়াই ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার আলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিচয় করাইয়া দেয়। যদি তাহাই হয়, তা'হলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি প্রকৃত পক্ষে কোন্‌টি মহত্তর? সগুণ ঈশ্বর না আত্মা? আত্মাই মহান্, কারণ ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রকাশ করে। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূল, সত্যস্বরূপ এই আত্মা সগুণ ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সগুণ ঈশ্বরকে বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে, এবং মনের দ্বারা চিন্তা করা যাইতে পারে; তিনি

তাহা হইলে বাক্য ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বাক্য মনের পরিচালক সেই আত্মারও অধীন। আমরা ইহাও জানি যে, যিনি যাহার অধীন তিনি তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। আবার ইহাও সত্য যে, যখন আমরা আমাদের আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করি, তখন আমরা একটি পুস্তক বা একটি বৃক্ষের ন্যায় জ্ঞেয়ভাবে জানিতে চেষ্টা করি না; 'আত্মা' কখনই উক্তরূপে জ্ঞেয় হইতে পারেন না। আত্মা সর্ব্বদাই জ্ঞাতা। আত্মার কোনও প্রকার আকার দেখিতে চেষ্টা করা বৃথা। কারণ আত্মার কোন আকার নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির মধ্যে আমাদের আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করা বৃথা, কারণ উক্ত পদার্থগুলি আপেক্ষিক রাজ্যের বিষয়। কিন্তু আত্মা অতীন্দ্রিয় ও নির্ব্বিশেষ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

এইরূপে আপেক্ষিক ও নির্ব্বিশেষ রাজ্যের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। যতক্ষণ আমরা আপেক্ষিক রাজ্যে অবস্থান করিব ততক্ষণ আমরা নির্ব্বিশেষকে পাইব না, কারণ এক নির্ব্বিশেষ জ্ঞান দ্বারাই পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ বস্তুসকলের অস্তিত্ব আমরা জানিয়া থাকি এবং তজ্জন্যই এই নির্ব্বিশেষ সম্বন্ধভাবযুক্ত রাজ্যের বহিঃপ্রদেশে অবস্থান করে এবং সর্ব্বদা অসীম পরিদৃশ্যমান বাহ্য বিষয়সকল সেই অসীমের অন্তর্নিহিত এবং তাহারই সত্ত্বায় সত্ত্বাবান্; কিন্তু সেই নির্ব্বিশেষ আত্মা স্বাধীন

এবং স্বয়ম্ভূ। যদি আমরা বিচারবুদ্ধিহীন হইতাম এবং যদি ঐ অবস্থায় আমাদের মধ্যে আত্মজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সহিত ইন্দ্রিয়জ্ঞান এবং মনোভাবের কোনও সম্বন্ধ থাকিত না অর্থাৎ অনুভূতিসাপেক্ষ কোন প্রকার জ্ঞানই আমাদের হইত না। মুক্তার মালা যেমন এক সূত্রে গ্রথিত থাকে সেইরূপ এক নির্ব্বিশেষ আত্মারূপী সূত্রে আমাদের বিভিন্ন ধারণাসমূহ, বিভিন্ন ভাবরাশি এবং বিভিন্ন চিন্তারাজি-স্বরূপ মুক্তাগুলি গ্রথিত হইয়া একটি সুন্দর মালারূপে প্রতীয়মান হইতেছে। নির্ব্বিশেষ আত্মা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতারূপ মুক্তাগুলিকে যথাযথ স্থানে গ্রথিত করিয়া সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন মালার আকারে পরিণত করিতেছে;—অর্থাৎ এই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের মধ্যেই আপেক্ষিক জ্ঞানরাশি মুক্তাকারে যেন শোভিত হইতেছে। কেহ যেন এরূপ ভ্রম না করেন যে, এই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান এবং সাধারণ আপেক্ষিক জ্ঞান একই শ্রেণীভুক্ত। প্রথমটি অসীম এবং দ্বিতীয়টি সসীম ও অজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানমাত্র। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অজ্ঞতাকে জানাইয়া দেয় বলিয়া সকল প্রকার আপেক্ষিক জ্ঞান অপেক্ষা মহান্ ও শ্রেষ্ঠ। এই আত্মজ্ঞানের আলোকেই আমরা "ইহা জানি বা ইহা জানি না" এবম্প্রকার উপলব্ধি করিতে পারি।

বেদান্ত উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, "যিনি দর্শন করেন, যিনি শ্রবণ করেন, যিনি চিন্তা করেন এবং যিনি মনোগত ভাব সমূহ উপলব্ধি করেন, তাঁহার সাক্ষী স্বরূপ জ্ঞাতা যিনি তিনিই

আত্মা। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত—এই সকলগুলিকে আমরা আত্মা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি; ইহারা আত্মা নহে। ইহাদিগকে যিনি জানেন, তিনিই আত্মা।"

উক্ত প্রকার দেহাত্মবোধরূপ ভ্রমবশতঃ আমরা বলিয়া থাকি যে, 'আমি দেহ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত', 'আমিই দ্রষ্টা', 'আমিই শ্রোতা,' 'আমিই মন-বুদ্ধিযুক্ত,' 'আমিই চিন্তা করিতেছি,' এই 'অহং' বা 'আমি' আত্মার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বলিয়াই আমরা উক্ত প্রকার 'অহং' ভাবাপন্ন হই। বস্তুতঃ এই 'অহং' জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। আত্মজ্ঞান এবং আমাদের অস্তিত্ব অভিন্ন ও এক। 'এই স্থানে আমরা আছি', এই যে জ্ঞান তাহা আমাদের স্বতঃই রহিয়াছে। যদি মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের এই জ্ঞান চলিয়া যায়, অথবা যদি মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের পারিপার্শ্বিক জ্ঞান তিরোহিত হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বিষয়গুলির সহিত সমস্ত সম্বন্ধই হারাইব এবং ঐ কালের জন্য আমাদের অস্তিত্বও থাকিবে না। এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা আমাদের অস্তিত্ব বা সত্তা হইতে আত্ম-জ্ঞানকে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করিলেও উহাতে কখনই কৃতকার্য্য হইব না। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান ও অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য; যখন আমরা আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিব তখন আমরা আমাদের অস্তিত্বও বুঝিতে পারিব এবং দেখিতে পাইব যে, মনের পরিচালক আত্মাই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং অসীম সত্তাস্বরূপ। 'সূর্য্য

রহিয়াছেন' এই কথা আমরা বলি কেন? তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান রহিয়াছে বলিয়াই আমরা ইহা কহিয়া থাকি; যখন তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, যেমন মূর্চ্ছাবস্থায়, তখন তিনি আমাদের পক্ষে অবর্ত্তমান; সুতরাং আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞান ও আপেক্ষিক সত্তার মাপকাটি হইতেছেন প্রজ্ঞা বা 'অহং' জ্ঞান; অর্থাৎ 'আমি আছি' এই বোধ না থাকিলে আমি অপর কোনও বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিব না, বা অপর কিছু আছে এই প্রকার জ্ঞানও আমার হইবে না। যে মুহূর্ত্তেই আমাদের দেহ-জ্ঞান এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয়ের জ্ঞান রহিত হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের নিকট উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়; এইরূপ ব্যাপার সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রার সময় আমাদের ঘটিয়া থাকে। তজ্জন্য সেই সময়ে আমরা 'ইহা আমার' 'উহা আমার' ইত্যাকার ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু আবার দেহে যখন সংজ্ঞা আসিতে থাকে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে দেহটিকে এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় বস্তুকেই 'আমার' বলিয়া অনুমিত হয়; অতএব দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধ জ্ঞান এবং অস্তিত্ব এই দুইটিই এক।

বেদান্ত দর্শনে মনের পরিচালক আত্মার দুই প্রকার ধর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে,—একটির নাম 'সৎ' অস্তিত্ব অর্থাৎ যাহা নিত্য বর্ত্তমান এবং অপরটির নাম 'চিৎ' অর্থাৎ যাহা নিত্যপ্রকাশ বা জ্ঞান। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এই 'সৎ' এবং 'চিৎ'

অবিচ্ছেদ্য—একটি থাকিলেই অপরটিও সেইখানে থাকিবে। বেদান্তে আত্মার আর একটি ধর্ম্মের উল্লেখ পাওয়া যায়—উহার নাম 'আনন্দ'। যেখানে 'সৎ' ও 'চিৎ' বর্ত্তমান, সেখানে 'আনন্দ'ও বর্ত্তমান থাকিবে। এই নিত্য আনন্দের সহিত পরিবর্ত্তনশীল ইন্দ্রিয়সুখের এবং অনিত্য বিষয়জনিত বিষয়ানন্দের প্রভেদ আছে। যেখানে 'নিত্য আনন্দ' বর্ত্তমান, সেখানে চির শান্তিও বিরাজমান থাকিবে এবং সেই অবস্থায় মন অন্য কিছুই না চাহিয়া ঐ আনন্দই উপভোগ করিবে ও যাহাতে উহার বিচ্ছেদ না আসে, সেইরূপে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। কখন কখন আমরা সাধারণ আনন্দকে অর্থাৎ বিষয়ানন্দকে আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। বিষয়ানন্দ যখন ভোগ করা যায়, তখন উহা সেই সময়ের জন্য মধুর মনে হয়। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উহাতে বিতৃষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন ঐ বিষয় ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা না করিয়া উহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। একবার ভাবিয়া দেখুন যে, ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ কিরূপ ক্ষণস্থায়ী ; উহা অতি অল্প সময়ই থাকে এবং উহার প্রতিফল অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা যথার্থ 'আনন্দ' তাহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' কহে। তাহা অপরিবর্ত্তনশীল, চিরস্থায়ী, এবং তাহার কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া নাই। যখন দেহাত্মবোধ চলিয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয়, তখনই ব্রহ্মানন্দ ও নির্ম্মল শান্তি বিরাজ করে। আত্মার রাজ্যই এই প্রকার, ইহা আপেক্ষিক জগতের এবং পার্থিব নিয়মাদির

বহিঃসীমায় অবস্থিত। অতঃপর সেই সত্যানুসন্ধিৎসু বাহ্য জগতের সমস্ত বস্তুর মূল কারণ ও মনের পরিচালক আত্মাকেই সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে সমাধি অবস্থায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তাহার পরে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন। দেহ পরিবর্ত্তনের নামই মৃত্যু। এই দেহের মৃত্যু হইতে পারে, মনের মৃত্যু হইতে পারে, ইন্দ্রিয়াদির মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার কখনও মৃত্যু নাই। যখন আমরা জানিতে পারি যে, দেহের মরণাপন্ন অবস্থা ঘটিতেছে, তখন যদি আমরা তাহার সহিত আমাদিগকে আত্মবোধ দ্বারা একীভূত না করি, এবং তখন যদি আমরা আমাদের নির্ব্বিশেষ আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অমরত্ব লাভ করিতে পারিব। একবার যদি আমাদের মধ্যে 'সোঽহং আত্মা' আমি সেই আত্মা এই অনুভূতি হয়, তাহা হইলে মৃত্যু কি করিয়া উহা পরিবর্ত্তন করাইয়া দিতে পারে? যাহা 'অসৎ' অর্থাৎ যাহা নাই তাহা হইতে 'সতের' উৎপত্তি হইতে পারে না; সেইরূপ 'সৎ' কখনও 'অসতে' পর্য্যবসিত হয় না। যাহা 'নিত্য', তাহা অনিত্য হইতে পারে না, ইহাই অমরত্ব বা অমৃতত্বের প্রমাণ। নির্ব্বিশেষ আত্মা অমর—ইনিই সেই নিখিল বিশ্বের আদি ও অন্তস্বরূপ ব্রহ্ম। ঐ নিত্য আত্মা বা ব্রহ্মকে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে সাধারণ লোক 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ঐ ব্রহ্মই

অন্তরাত্মারূপে আমাদের অন্তরে বাস করেন এবং আমাদের আত্মা হইতে ঐ 'ব্রহ্ম' অভিন্ন। তাঁহাকেই উপনিষদে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কারণ উহা এক ভিন্ন বহু নহে। যদি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বহু থাকিত, তাহা হইলে একটি অপরটির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেন ; সুতরাং তাঁহারা অসীম ব্রহ্ম হইতে পারিত না। এক ব্রহ্মই অবিনশ্বর ও মৃত্যু-রহিত। একমাত্র তাঁহাকে বিদিত হইয়া আমরাও অমৃত হইতে পারি। যদি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের আত্মাতে অমরত্ব নিহিত না থাকে, তাহা হইলে কোনও অবতার পুরুষই উহা আমাদিগকে দান করিতে সক্ষম হইবেন না। খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ি-গণ বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র ঈশ্বরাবতার যিশুখৃষ্টের কৃপাতেই মরণশীল জীবাত্মা অমর হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস 'আমাদের আত্মার মৃত্যু নাই' এই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উক্ত সম্প্রদায়িগণের এইরূপ আস্থায় এবং উপদেশে বেদান্তমতাবলম্বীরা প্রতারিত হ'ন না। তাঁহারা প্রথমে তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তৎপর তাঁহারা জানিতে পারেন যে, অমরত্ব তাঁহাদের জন্মগত স্বত্ত।

আত্মা সর্ব্বপ্রকার শক্তির মূল—এই হেতু শিষ্য বলিলেন, "আত্মজ্ঞানের দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও অমরত্ব লাভ করা যায়।" অপরিবর্ত্তনশীল, অবিনশ্বর আত্মাকে জানিতে পারিলেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত আত্মিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। আত্মজ্ঞানের

দ্বারা যে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায়, তাহা ভৌতিক, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি সমূহের সমষ্টি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন আর সকল প্রকার শক্তিই পরিবর্ত্তনশীল ও মৃত্যুর অধীন। অল্প লোকেই আধ্যাত্মিক শক্তির অর্থ ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারেন। 'আত্মা' শব্দদ্বারা 'প্রেতাত্মা'কে বুঝায় না; ইহার দ্বারা 'পরমাত্মা' বা 'ব্রহ্ম'কে বুঝিতে হইবে। চৈতন্যস্বরূপ আমাদের আত্মা সেই ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্তু নহে। ব্রহ্ম বা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেই দৈহিক ও মানসিক শক্তি অপেক্ষা মহত্তর আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায়। এই শক্তি সেই অনন্ত ব্রহ্মের বা আত্মারই শক্তি। দৈহিক শক্তির সাহায্যে হয়ত একজন একটি ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন বা সহস্র সহস্র প্রাণী বধ করিতে পারেন; কিন্তু ঐ শক্তি তাহাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি কাহারও প্রভূত আধিভৌতিক ক্ষমতা থাকে তাহা হইলেও উহা তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না; কাহারও হয়ত অদ্ভুত মানসিক শক্তি ও যোগের বিভূতি থাকিতে পারে এবং ঐ শক্তির সাহায্যে তিনি অনেক আশ্চর্য্য-জনক কার্য্যাদি করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার দেহ ও মনের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন স্বতঃই হইয়া থাকে, তিনি ঐ শক্তির দ্বারা তাহা স্থগিত রাখিতে পারেন না। অপর পক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হইলেই জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যিনি কেবল দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয়

করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যুর অধীনই থাকিবেন; কিন্তু তিনি যদি সেই অবনাশী ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন, তাহা হইলে এই বিশ্বের প্রভু বা নিয়ন্তা হইতে পারেন। যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, প্রাকৃতিক বিরাট্ শক্তি সমূহ তাঁহার সেবা করে এবং আদেশ পালন করে। "যদি কেহ এই জীবদ্দশায় আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। এই মায়াময় জগতে যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন তিনিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন। তিনিই মোক্ষ, পরাশান্তি এবং প্রকৃত আনন্দ এই জীবনে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাকে এই জীবদ্দশায় জানিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখভোগ আছে" * যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে না পারেন, তিনি এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন ও অনেক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেন; তিনি কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না।

"সুধীগণ চেতন ও অচেতন বস্তুতে সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া দেহত্যাগ করিবার পরে অমরত্ব

---

* "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"
—কেনঃ, উপঃ, ২য় খঃ ১৩।

লাভ করিয়া থাকেন।"* যিনি সেই একমাত্র অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাতে মিশিয়া এক হইয়া যান এবং অনন্তকাল সেইরূপই থাকেন।

* "ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ, প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।"
—কেনঃ, উপঃ, ২য় খঃ ১৩।৫।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। ছাঃ, উঃ ;—৭।২৩।১॥

"আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

ছাঃ, উঃ,—৭।২৫।২॥

"যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তাহাই সুখ ; যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই সুখস্বরূপ ; অতএব এই ভূমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

"আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমুদয় জগৎ।

যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান (অনুভূতি) লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হ'ন, তিনিই স্বরাট্ হ'ন অর্থাৎ স্বারাজ্য লাভ করেন এবং সমস্ত লোকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন।"

আত্মা ও অমরত্ব

যজুর্ব্বেদান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা পাঠ করিয়া থাকি যে, পুরাকালে ভারতবর্ষে যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যদর্শী ঋষি বাস করিতেন। মৈত্রেয়ী নামে তাঁহার এক সাধ্বী পতিগতপ্রাণা স্ত্রী ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমের যে সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম কেবল তাহা সম্পন্ন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, পরন্তু দেশের ও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যও তিনি যথেষ্ট সৎকর্ম্ম সাধন করিয়া মহাশান্তিতে কালাতিপাত করিতেন। এইরূপে নিঃস্বার্থ সৎকর্ম্মাদির দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নিত্য, সত্য আত্মার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি তপোমার্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যজগৎ ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য এবং গার্হস্থ্য জীবন মনুষ্যের ক্রমোন্নতির পক্ষে একটি সোপান বা স্তর মাত্র; তজ্জন্য তিনি মনস্থ করিলেন যে, তিনি গৃহস্থাশ্রম হইতে অধিকতর উন্নত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিবেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সংসারী জীবসকল মোহে অভিভূত হইয়া পার্থিব বাসনা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই কারণে তিনি নির্জ্জনে বাস করিয়া নিত্য-বস্তুর ধ্যানে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবার

জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সংসারের কোলাহলের বহুদূরে অরণ্যের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন—পরমাত্মার ধ্যানে দিবানিশি নিমগ্ন থাকিয়া এবং চিত্ত-নিরোধরূপ সমাধি লাভ করাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল।

একদিন এই ঋষি তাঁহার পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন :— "মৈত্রেয়ী, প্রিয়তমে! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সমস্ত ধন-সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া আমি বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করি। তুমি এই সমস্ত ভোগ কর এবং সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর।"* স্বামীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণা মৈত্রেয়ী সন্তপ্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যদি আমি সমগ্র পৃথিবী এবং তৎস্থিত সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হই তাহা হইলে আমি কি তাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারিব?"† এখন আমরা যে সমস্ত স্ত্রী দেখিতে পাই তাঁহারা ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার জন্য লালায়িতা; আবার যদি কোনও সূত্রে সামান্য সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারিণী হইবার কাহারও আশা থাকে

---

* "মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি।" বৃহদারণ্যক, উপঃ, ৪।৫।২ ॥

† "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো।" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৩ ॥

তাহা হইলে তাহাতেই তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইয়া থাকেন। মৈত্রেয়ী কিন্তু এই শ্রেণীভুক্তা স্ত্রী ছিলেন না; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অমরত্বের ন্যায় মহৎ ঐশ্বর্য্য আর কিছুই নাই। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি যে সমস্ত ধন-সম্পত্তি আমাকে দান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইলে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব?" এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিলেন, "না, এইরূপ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অমরত্ব লাভের কোনও আশা নাই; কেহ কখনও পার্থিব সম্পত্তিদ্বারা অমর হইতে পারে না। তবে যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হও তাহা হইলে তুমি ধনবান্ লোকের মত যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তাহা পূরণ করিয়া পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারিবে।"* এই কথা শুনিয়া স্ত্রী বলিলেন, "স্বামিন্, যে বস্তুদ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, সে বস্তু লইয়া আমি কি করিব? যদি আপনার নিকট এমন কোনও বস্তু থাকে যাহার দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই বস্তু দান করুন্, আমি আপনার অন্য ঐশ্বর্য্যের জন্য লালায়িতা নহি।" §

* "নেতি; নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং, তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি॥"

—বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৩॥

§ "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৪॥

মৈত্রেয়ীর কথা শুনিয়া তাঁহার স্বামী মহর্ষি বলিলেন, "মৈত্রেয়ী, বাস্তবিকই তুমি আমার প্রিয়তমা; তুমি তোমারই উপযুক্ত কথা বলিয়াছ, যাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় তাহাই আমি বলিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।"* তৎপর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পরম প্রেমাস্পদ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ কি তাহা প্রথমে ব্যাখ্যা করিলেন। লোকে তাহাদের পিতা-মাতাকে, সন্তানাদিকে, স্বামীকে, স্ত্রীকে এবং ধনসম্পত্তি ও অন্যান্য যাহা কিছু আপনার বলিতে আছে তাহা ভালবাসে; কিন্তু তাহারা কাহাকে বস্তুতঃ ভালবাসে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহাদের প্রকৃত ভালবাসার পাত্র কখনও কোন পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক আকৃতির পশ্চাতে যে আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন তাহাই প্রকৃত ভালবাসার পাত্র হইয়া থাকে। এই কারণে মহর্ষি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন:—"প্রিয়ে, তোমাকে সত্যই বলিতেছি যে, স্ত্রী তাহার স্বামীর পাঞ্চভৌতিক দেহকে স্বামী বলিয়া ভালবাসে না; তাহার স্বামীর মধ্যে যে আত্মা অবস্থান করিতেছেন তিনিই যথার্থ স্বামীরূপে স্ত্রীর নিকট প্রিয় হইয়া থাকেন।"†

---

* "স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়ং বৃধৎ হন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি॥"

—বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৫॥

† "স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি॥" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৬॥

স্বামীর পাঞ্চভৌতিক শরীর যে সমস্ত জড় পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত সেই সমস্ত উপাদানকে স্ত্রী ভালবাসে না ; সে তাহার স্বামীর আকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত সেই আত্মাকেই ভালবাসিয়া থাকে। আবার, "স্বামী তাহার স্ত্রীর স্থূল শরীরকে স্ত্রী বলিয়া ভালবাসে না ; কিন্তু ঐ স্ত্রীর দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন তাহাই স্বামীর প্রেমাস্পদ।" * প্রকৃত পক্ষে, স্ত্রীর স্থূল দেহটি স্বামীর নিকট প্রিয় নহে, কিন্তু তাহার আত্মাই স্বামীর নিকট প্রিয় বস্তু। যখন স্ত্রীর দেহ হইতে আত্মা চলিয়া যায়, তখন সেই মৃতদেহটির প্রতি স্বামীর ভালবাসা থাকে না, এমন কি স্বামী তখন উহা আর স্পর্শই করিবে না। "লোকে তাহাদের সন্তানগণের জড়দেহকে সন্তান বলিয়া ভালবাসে না ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন বলিয়া তাহারা এত ভালবাসার পাত্র হইয়া থাকে।" †

যখন মাতা তাঁহার সন্তানকে ভালবাসেন, তখন আপনারা কি মনে করেন যে, যে সমস্ত পাঞ্চভৌতিক জড় উপাদানের দ্বারা সন্তানের মুখ মণ্ডল গঠিত সেই সমস্ত অচেতন জড় পদার্থকে মাতা ভালবাসিতেছেন ? না, তাহা নহে ; জড় পরমাণুপুঞ্জের অন্তরালে অবস্থিত আত্মাই সন্তানের আকৃতি

* "ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৬।

† "ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি।" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৬।

সৃষ্টি করিয়া মাতার আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভৌতিক-জড় পদার্থের মধ্যে ভালবাসার অস্তিত্ব দেখা যায় না। আত্মিক রাজ্যে দুইটি আত্মার পরস্পরের আকর্ষণের নামই প্রেম অথবা ভালবাসা। যখন লোকে তাহাদের বন্ধু বা আত্মীয়বর্গকে ভালবাসে তখন সেই আকর্ষণটিই উহাদের প্রণয়ের বাহ্যিক প্রকাশের মূলে রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। "প্রিয়ে, বাস্তবিকই বিত্ত (ধন) ভালবাসার পাত্র নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আত্মার প্রতি ভালবাসা আছে তজ্জন্য ধন, ঐশ্বর্য্য প্রিয় বস্তু বলিয়া বোধ হয়।"*

ভালবাসার কেন্দ্র হইতেছে আত্মা; যখন আমরা ঐশ্বর্য্য বা বিষয় সম্পত্তিকে প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে করি তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অর্থ, ধন বা সম্পত্তির উপর যে আকর্ষণ বা ভালবাসা দেখা যায় তাহা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত আত্মার অথবা নিজ আত্মার প্রতি ভালবাসা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যে পশু, পক্ষী, অশ্ব, কুকুর প্রভৃতিকে ভালবাসিয়া থাকি তাহা উহাদের স্থূল দেহের জন্য নহে; কিন্তু উহাদের মধ্যে আত্মা বিরাজ করেন বলিয়াই উহাদিগকে আমরা এইরূপ ভালবাসিয়া থাকি। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বুঝাইয়াছিলেন যে, যেখানেই প্রকৃত ভালবাসা আছে সেইখানেই আত্মার প্রকাশ বিদ্যমান। তিনি বলিলেন, "প্রিয়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

---

* "ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি ॥" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৬ ॥

প্রভৃতি মনুষ্যগণের মধ্যে আত্মা আছেন বলিয়াই লোকে তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে।"

কাহারও মৃত দেহটি আমাদের অন্তঃকরণে ভালবাসা সঞ্চার করে না। "লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগকে, স্বর্গাদিলোককে, দেবতাদিগকে, বেদসমূহকে এবং অন্যান্য চেতন ও অচেতন বস্তু সকলকে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য ভালবাসে না; প্রত্যুত উহাদের মধ্যে আত্মার প্রকাশ আছে বলিয়াই লোকে উহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে।"*

যখন কেহ নিজের "অহং"এর তৃপ্তির জন্য অপরকে ভালবাসে তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভালবাসা অত্যন্ত স্বার্থ-জড়িত, কিন্তু যদি ঐ ভালবাসার প্রবাহ অপরের অন্তরস্থ আত্মার দিকে ধাবিত হয় তখন স্বার্থপরতা ভাবটি আর থাকে না। উহা ক্রমে ক্রমে পবিত্র ঐশ্বরিক প্রেমে পরিণত হয়। জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই অপরিবর্ত্তনীয় চৈতন্যময় আত্মা বিরাজ করিয়া অপরের আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমরা

* "ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।৬॥

সেই আত্মার স্বরূপ অবগত নহি যাহার অভিমুখে আমাদের স্বার্থপর অথবা নিঃস্বার্থ ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং যাহা হইতে উক্তস্রোত নিঃসৃত হইয়া মনুষ্য, পশু, দেবতা অথবা পার্থিব ধন, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি ধাবিত হইতেছে। একজন কৃপণ মোহ বশতঃ তাহার ধন, ঐশ্বর্য্যকে ভালবাসে কিন্তু সে ভালরূপে জানে যে, ঐ ধন কেবল বিনিময়ের একটি উপায় মাত্র এবং ঐ ধনের দ্বারা কিছু দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য মাত্র লাভ করিতে পারা যায়। সে নিজের দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া দেহটিতেই অত্যন্ত আসক্ত এবং সেই দেহটিকে পরিপাটী রাখিবার উপায় স্বরূপ ঐ অর্থকেই ভালবাসিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকের স্থূল দেহটিই হইতেছে আকর্ষণের কেন্দ্রস্বরূপ অর্থাৎ যাহা কিছু সে করে তাহা ঐ দেহের তৃপ্তির জন্যই করে এবং সেই কারণবশতঃ যাহা কিছু তাহাকে সুখী করে তাহা তাহার অতীব প্রিয় বস্তু। "মৈত্রেয়ী, তজ্জন্য আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই আত্মার বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে এবং এই আত্মার ধ্যান করিতে হইবে। প্রিয়ে, যখনই এইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তখনই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।"* যাহা হইতে

* "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মানো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।" বৃহঃ, উপঃ, ২।৪।৫।

অবিরাম প্রেমধারা নিঃসৃত হইতেছে এবং যাহার অভিমুখে তাহা প্রবাহিত হইতেছে সেই সর্ব্বপ্রকার আকর্ষণের কেন্দ্র-স্বরূপ আত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম সকলকেই জানিতে হইবে। আত্মার বিষয় সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে হইবে এবং তাঁহার ধ্যান করিতে হইবে; যখন এই আত্মাতে মন নিবিষ্ট হইবে তখনই ইঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞান ও অমরত্ব লাভ হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, "যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে তাহার স্থূল দেহ অথবা তাহার ধন সম্পত্তির জন্য ভালবাসে তাহা হইলে সে ঐ প্রেমাস্পদ ব্যক্তি কর্তৃক নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে পরিত্যক্ত হইবে। যদি আমরা কাহারও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না রাখিয়া অচেতন পরমাণুসমষ্টি-স্বরূপ তাহার জড় দেহটিকেই ভালবাসি অর্থাৎ তাহার "আত্মা" বলিয়া কোন বস্তু নাই এই ধারণা করিয়া জড় দেহটিই সেই ব্যক্তি এই বিবেচনা করি এবং তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহটির প্রতি ভালবাসা দেখাই তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি সন্তুষ্ট হইতে পারে? কখনই না। বরং সেই ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিবে; যদি আমরা কোনও ব্রাহ্মণকে আত্মারহিত জড় পদার্থস্বরূপ ধারণা করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করি এবং যদি তিনি আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারেন তাহা হইলে অবিলম্বে তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।"*

* "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদা-

যদি আমরা রাজার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি যে, তিনি আত্মাহীন জড় পদার্থের পিণ্ড তাহা হইলে রাজা আমাদিগকে কখনই ভাল বাসিবেন না বরং তিনি আমাদিগকে দূর করিয়া দিবেন। "এই কারণ বশতঃ যিনি মনে করেন স্বর্গাদি লোক সমূহের মধ্যে আত্মা নাই, দেবতাগণের মধ্যে আত্মা নাই, বেদসমূহের মধ্যে আত্মা নাই, বা চেতন ও অচেতন প্রাণিগণের মধ্যে আত্মা নাই তিনি উপরিউক্ত প্রত্যেকটির দ্বারা পরিত্যক্ত হইবেন।" যদি আমরা পরলোকগত আত্মীয় স্বজনের ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে "আত্মা নাই" এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করি তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি আমরা ঈশ্বরকে অচেতন জড় পদার্থ বলিয়া ধারণা করি এবং তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ অবিনশ্বর পরমাত্মাকে ভালবাসিতে না পারি তাহা হইলে তিনি কখনই আমাদিগের নিকট আসিবেন না বরং আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, আত্মার অস্তিত্বকে বাদ দিলে কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না এবং আত্মার সহিত সম্বন্ধ বাদ দিয়া আমরা

স্তোহন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ। লোকাস্তং পরাদুর্যোহন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ। দেবাস্তং পরাদুর্যোহন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ। বেদাস্তং পরাদুর্যোহন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ। ভূতানি তং পরাদুর্যোহন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ। সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা॥" বৃহঃ, উপঃ, ২।৪।৬॥

যে কোন বস্তুর চিন্তা করিব সেই বস্তু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে কারণ বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সর্ব্বব্যাপী আত্মার সম্বন্ধে জড়িত থাকিয়া অবস্থান করিতেছে। আত্মা আছেন এবং সর্ব্বভূত আত্মাতে আছেন। যাহা কিছু আমরা দর্শন করি অথবা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ; যাহা কিছু আমরা জানি এবং চিন্তা করি তৎসমুদয় আত্মার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংস্পৃষ্ট ; বস্তুত উহা আত্মার সহিত অভিন্নরূপে বর্ত্তমান। প্রকৃত পক্ষে উহা সেই আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রত্যেক বস্তুই আত্মা হইতে অভিন্ন ইহা আমাদিগের উপলব্ধি হওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন :—"ঢাকের কাঠির দ্বারা আঘাত করিলে ঢাক হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দ যে অন্যান্য প্রকার শব্দ হইতে পৃথক্ এই তথ্য বুঝিতে হইলে যেমন ঐ শব্দের মূল ভিত্তিস্বরূপ ঢাক বা ঢাকের কাঠির উল্লেখ করিলে বুঝা যায়, অন্য কোন উপায়ে উহার পার্থক্য বুঝা যায় না, সেইরূপ কোনও বস্তুর অস্তিত্ব বোধের মূলে যে জ্ঞান স্বরূপ আত্মা রহিয়াছেন এবং যাঁহা ভিন্ন কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না, সেই আত্মার অস্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া উহার বৈশিষ্ট্য জ্ঞান হইয়া থাকে নতুবা ঐ বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব বোধ হয় না।*

---

* "স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।" বৃহঃ, উপঃ, ২।৪।৭।

"শঙ্খ, বীণা বা কোনপ্রকার বাদ্য যন্ত্র বাদিত হইলে যে ধ্বনি শ্রবণ করা যায় সেই ধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে যাহা হইতে ঐ ধ্বনি উদ্ভূত হইতেছে তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়; আবার এই যে বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি উহা বস্তুতঃ একই মূল শব্দের ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশমাত্র। সেইরূপ এই বিশ্বরাজ্যের মূলে একমাত্র সত্য বস্তু যে সর্ব্বব্যাপী আত্মা বিদ্যমান আছেন তিনিই বিভিন্ন নাম রূপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।*

যেমন আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে আপতঃ প্রতীয়মান ধূম ও অগ্নিবিহীন ঐ কাষ্ঠরাশি হইতে প্রথমে ধূমরাশি ও পরে অগ্নিশিখা সমূহ নির্গত হয়, হে প্রিয়তমে! সেইরূপ সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর সেই এক পরমাত্মা (ব্রহ্ম) হইতে স্বতঃই (ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব) চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্র সমূহ এবং উপনিষৎ, বিজ্ঞান, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা ইত্যাদি যাহা কিছু এই জগতে বা অন্যান্য লোকসমূহে জ্ঞাতব্য আছে তৎসমুদয়ই নিঃসৃত হইয়াছে।"†

---

* "স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ॥" বৃহঃ, উপঃ, ২।৪।৮॥

† স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি॥" বৃহঃ, উপঃ, ২।৪।১০॥

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি যে, অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা এই এই জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিয়াছি ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান যাহা পদার্থবিৎ, দার্শনিক, যোগী, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্তই অনন্ত জ্ঞানের আধার-স্বরূপ এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত বা নিঃসৃত হইয়াছে। যেমন এক প্রজ্বলিত বহ্নি হইতেই ধূম, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিশিখাসমূহ নির্গত হয় সেইরূপ এক অনন্ত ব্রহ্ম হইতে বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে বর্ণিত আধ্যাত্মিক সত্য এবং কলাশাস্ত্র ও ইতিহাস অন্তর্গত তথ্যসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের যে স্বাভাবিক জ্ঞান (Common sense) আছে এবং যাহা আমরা আমাদের দৈনিক জীবনে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা সেই নিত্য, এক অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল ও অনন্ত জ্ঞানসমষ্টি স্বরূপ আত্মারই বিকাশ মাত্র—এই জ্ঞান-ঘনকে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থূল, সূক্ষ্ম বস্তু এবং শক্তিসমূহ প্রকৃতির অব্যক্তরূপে এক অনন্ত ব্রহ্মে লীন ছিল এবং ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী সেই সুপ্তা প্রকৃতি স্বতঃই নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন :—

"তর্হ্যেদমব্যাকৃতমাসীৎ"।

যেমন ব্যক্তিমাত্রই ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে বায়ুরাশি নিশ্বাসরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে অনায়াসে প্রশ্বাসরূপে বহির্গত করিয়া

থাকেন সেইরূপ এই নিখিল বিশ্বজগতের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থূলবাহ্য ও সূক্ষ্মভূত ও শক্তিসমূহ এবং সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্রহ্মের প্রসুপ্তা প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত কারণরূপে অবস্থিত ছিল তাহা বিশ্বসৃষ্টির বা অভিব্যক্তির সময় স্বতঃই বহির্গত হয়। আবার যেমন ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার নদীর জল এক সমুদ্রেই প্রবাহিত হয় সেইরূপ প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থূল, সূক্ষ্ম বস্তু এবং জ্ঞানরাশি সেই অনন্ত ব্রহ্মের প্রকৃতিতে লীন হয় ও তথায় সুপ্তরূপে অবস্থান করে ; এই ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রই সমস্ত জ্ঞানরাশি ও বাহ্য বস্তু নিচয়ের আধার এবং অন্তে এই সমস্তই আবার ঐ সমুদ্রেই মিশিয়া যায়।* "যেরূপ সর্ব্বপ্রকার স্বাদ জিহ্বা দ্বারাই গ্রহণ করা যায়, সর্ব্বপ্রকার স্পর্শ কেবল ত্বক্‌দ্বারা অনুভব করা যায়, সর্ব্বপ্রকার গন্ধমাত্র নাসিকা দ্বারাই অনুভূত হয়, বিভিন্ন প্রকার বর্ণ কেবল চক্ষু দ্বারাই দৃষ্ট হয়, সর্ব্বপ্রকার শব্দ মাত্র

---

* "স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্ব্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সার্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং আনন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্ব্বেষাং বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্ব্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্॥"

—বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।১২।

কর্ণদ্বারা শ্রুত হয়, যেমন মানসিক ভাব সমূহের আকর কেবল মন এবং সর্ব্বপ্রকার বিবেক জ্ঞানের আকর কেবল বুদ্ধি, যেমন সকল বিদ্যার আকর হৃদয়, সকল কর্ম্ম হস্তদ্বারা করা হয়, সকল আনন্দের আধার উপস্থ, যেমন পায়ু কেবল বিসর্গের মূলে থাকে, পদদ্বয় গমনাগমনের একমাত্র যন্ত্র, বাগ্ যন্ত্র যেমন বেদোচ্চারণের মূলে আছে সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার বোধ ও জ্ঞান সেই এক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে উদ্ভাসিত হয়।"

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বুঝাইতেছেন যে, ব্রহ্মই সকল বস্তুর আদি ও অন্ত; অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর অভিব্যক্তি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতেই হইতেছে এবং প্রলয়কালে সমস্তই আবার সেই পরমাত্মাতেই লীন হইতেছে। এই ব্রহ্ম যেন এক অদ্বিতীয় চৈতন্যঘন স্তূপস্বরূপ, ইহাতে অপর কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। ইহাকে বহু বস্তুর সমষ্টি বলা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—"যেমন এক তাল লবণের ভিতরের মধ্যভাগের ও বহির্ভাগের মধ্যে কোনও তারতম্য নাই, কিন্তু উহাতে যেমন লবণের স্বাদ সর্ব্বত্র পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে; সেইরূপ ব্রহ্মেরও মধ্যপ্রদেশ বা বহিঃপ্রদেশের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; উহা জ্ঞানময় স্তূপ সদৃশ—যাহার আদিও নাই, অন্তও নাই; এবং যাহা অসীম।"*

* "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥"

—বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।১৩।

এই অসীম ও অনন্ত বস্তুর দুইটি ভাব আছে—একটি সমষ্টি ভাব যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয় এবং অপরটি ব্যষ্টিভাব যাহাকে আত্মা বলা হয়। 'অহং' জ্ঞানের উৎসরূপে অর্থাৎ 'আমি আছি' এই জ্ঞানের মূলস্বরূপ ইনি ব্যষ্টিভাবে আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হ'ন। আবার যখন এই আত্মা মৃত্যুর সময় স্থূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হন, তখন ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের বিষয়গুলিকে গ্রহণ করিতে বিরত হয় এবং মাত্রাগুলি যে স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল সেই কারণ অবস্থায় প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুর পরে কেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদিকে আর গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন :—"প্রিয়ে, যদিও আমি তোমার নিকট বলিয়াছি যে, আত্মা অখণ্ড জ্ঞানরাশিস্বরূপ তথাপি ইহা মনে রাখিও যে, যখন আত্মা এই দেহ হইতে চলিয়া যা'ন তখন তাহার মর্ত্ত লোকের ন্যায় জ্ঞান থাকে না। তখন আত্মার ইন্দ্রিয়রাজ্যের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন :—"প্রভু, আপনি যে বলিলেন, 'মৃত্যুর পরে ঐ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মর্ত্ত লোকের ন্যায় জ্ঞান থাকে না' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি ইহা কিরূপে হইতে পারে?"* যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "প্রিয়ে, আমি তোমাকে হতবুদ্ধি হইবার কথাত

---

* "সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি।" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।১৪।

কিছুই বলি নাই; আত্মার অবিনাশিত্বই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।" * তোমার সমস্যা দূরীভূত করিবার জন্য আমি উহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছি; আত্মা স্বতঃই মৃত্যুরহিত ও অমর। "যতক্ষণ বিষয়ী (জ্ঞাতা) ও বিষয় জ্ঞেয়রূপে দ্বৈতভাব বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ অনুভবযোগ্য জ্ঞেয় বিষয় ও অনুভবকর্ত্তা জ্ঞাতা পৃথক্ থাকেন ততক্ষণ সেই জ্ঞাতা দর্শন করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি অনুভব করেন, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ ও চিন্তা ইত্যাদি করিয়া থাকেন এবং সেই সকল বিষয়কে জানিতে পারেন।" †

ব্যক্তিগত আত্মা যতক্ষণ উক্ত প্রকার দ্বৈত ভূমিতে বা আপেক্ষিক রাজ্যে থাকেন ততক্ষণই তাঁহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমূহের অনুভূতি হয়। যখন দ্রষ্টার দৃশ্য-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে তখনই তাহার দর্শনানুভূতি সম্ভবপর। যে গন্ধ-দ্রব্যের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহার আঘ্রাণ আমরা কিরূপে পাইতে পারি? আস্বাদনীয় বা শ্রোতব্য বিষয়ের সহিত জ্ঞাতার (আত্মার) কোনও সম্বন্ধ না থাকিলে ঐ বিষয়ের অনুভূতিই হইবে না। এইরূপে দেখিতে

---

* "স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা-ঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা॥" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।১৪॥

† "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং-শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি॥" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।১৫॥

পাওয়া যায় যে, অনুভবযোগ্য বিষয়ের সহিত অনুভব-কর্ত্তার আপেক্ষিক সম্বন্ধ না থাকিলে কোনও প্রকার অনুভূতি উদয় হওয়া সম্ভবপর হয় না; আবার যখন আমরা গভীর নিদ্রায় সুষুপ্তিতে অভিভূত থাকি তখন আমরা দর্শন করি না, শ্রবণ করি না, আস্বাদন করি না, আঘ্রাণও করি না, বা কিছু বুঝিতেও সক্ষম হই না। জ্ঞেয় বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়রাজ্যেই অবস্থান করে, সুতরাং যখন আমরা অতীন্দ্রিয় ভূমিতে অবস্থান করি অর্থাৎ যে ভূমিতে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি ব্যাপার নাই সেই স্থানে কিরূপে দর্শনাদিরূপ ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

স্বপ্নশূন্য নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় প্রত্যেকেরই একই প্রকার উপলব্ধি হয়; এবম্প্রকার অবস্থায় স্ত্রীজাতি বা পুরুষ-জাতির মধ্যে উপলব্ধির কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না। "ঐ অবস্থায় পিতা অপিতা হ'ন অর্থাৎ পিতার পিতৃত্ব থাকে না ও মাতার মাতৃত্ব থাকে না।"* আবার সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ "যেখানে দ্বৈতভাব বা বহুত্ব ভাবের সম্পূর্ণ অভাব এবং যেখানে কেবল এক অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র বিদ্যমান সেখানে দর্শনই বা কি হইবে, আঘ্রাণ করিবার বিষয় বা কি থাকিবে এবং আস্বাদনই বা কিসের হইবে?" †

---

* "অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা" ইত্যাদি শ্রুতিতে আছে। বৃহঃ, উপঃ, ৪।৩।২২

† "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্‌, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ।" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।১৫ ॥

যেখানে আপেক্ষিকতার অস্তিত্ব নাই বা যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় কিছুই নাই সেখানে দর্শন-স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহার সাহায্য ব্যতীত কিছুই জানা যায় না তাহাকে কিরূপে জানিতে পারা সম্ভব?

যে আত্মা সকল বস্তু বা বিষয়ের একমাত্র জ্ঞাতা অর্থাৎ যিনি সকল বস্তু বা বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন সেই আত্মাকে আবার কোন্ জ্ঞানশক্তি অবগত করাইতে পারে? না, তাহা জানিবার জন্য দ্বিতীয় জ্ঞান নাই, কারণ আত্মাই এই নিখিল বিশ্বজগতের একমাত্র জ্ঞাতা।

এখন দেখিতে হইবে যে, আত্মাকে বিদিত হইবার উৎকৃষ্ট উপায় কি? যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমরা জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তু হইতে প্রকৃত জ্ঞাতা পুরুষকে পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে পারি; প্রত্যেক বস্তুকেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং মনে মনে 'নেতি নেতি' * অর্থাৎ "ইহা আত্মা নহে, বা আত্মা ইহাও নহে" এইরূপ স্থির করিয়া যাহা আত্মা নহে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞেয় পদার্থগুলি, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সর্ব্বপ্রকার চিন্তা, এবং মনের ভাব ও বুদ্ধির যাবতীয় ক্রিয়া শুদ্ধ-বিচারের দ্বারা চিত্ত হইতে একে একে

---

* "স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্তা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার॥" বৃহঃ, উপঃ, ৪।৫।১৫॥

অপসারিত হইলে সমাধি অবস্থায় আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়।

বুদ্ধি যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন তাহার দ্বারা আত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যায় না—'আত্মা' বুদ্ধির অগোচর। আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না—ইহা অমর; কেহ কোন উপায়ে আত্মার পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারে না—ইহা অপরবির্ত্তনশীল; আত্মাকে কিছুর দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায় না—ইহা অস্পর্শ; আত্মার কোনও প্রকার বন্ধন নাই—ইহা মুক্ত। আত্মার সুখ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই—ইহা সুখদুঃখের অতীত। আত্মা সর্ব্বদাই সমভাবে বর্ত্তমান আছেন। প্রিয়ে, যে আত্মার ধর্ম্ম এই প্রকার, সেই আত্মাকে কি উপায়ে এবং কাহার দ্বারাই বা জ্ঞাত হইতে পারা যায়? মৈত্রেয়ী, আত্মার স্বরূপ যাহা বলিলাম বাক্যের দ্বারা তাহা এই পর্য্যন্তই বর্ণনা করা যায়; ইহার অতীত যাহা কিছু আছে এবং যে জ্ঞানের দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা মাত্র সেই সমাধি অবস্থায় উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রেমের, জ্ঞানের, আনন্দের এবং সত্যের আধার বা মূল সেই আত্মাকে বিদিত হইলেই অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই উপদেশ প্রদান করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে তিনি সেই নিত্য-বস্তুর ধ্যানে কালযাপন করিতে লাগিলেন; অবশেষে সমাধি অবস্থায় তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ, যদ্দ্বারা আমরা এই বিশ্বকে

সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারি ; একমাত্র আত্মজ্ঞানের সাহায্যেই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে সমস্ত রহস্যই ভেদ হয়। যিনি আত্মদর্শন করিয়াছেন তিনি প্রলয়কালে জাগতিক বস্তু সমূহের কি হইবে তাহা পরিস্ফুটভাবে বুঝিতে পারেন। অমরত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলে এই 'আত্মাকে' জানিতে হইবে ; ইহা ব্যতীত আর অন্য কোনও উপায় নাই।

আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বৈদিক যুগের ঋষি বলিয়াছেন :— "অজ্ঞানান্ধকারের পারে অবস্থিত স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ মহান্ আত্মাকে আমি জানিয়াছি ; একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই ; অন্য কোন পন্থা নাই।"*

---

* "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"
—শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ—৩।৮।

স্বামী অভেদানন্দজীর বাঙ্গলা পুস্তকাবলী

1.	পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ—কাশ্মীর ও তিব্বত	2	0	0
2.	ভালবাসা ও ভগবৎ প্রেম	0	6	0
3.	আত্মবিকাশ	0	8	0
4.	বেদান্তবাণী	0	5	0
5.	স্তোত্র রত্নাকর	0	6	0
6.	হিন্দুধর্ম্মে নারীর স্থান	0	8	0
7.	স্বামী অভেদানন্দ (জনৈক ভক্ত কর্ত্তৃক লিখিত জীবনী)	0	5	0
8.	ভারত—অতীত ও বর্ত্তমান	1	4	0

পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ

পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উপযোগী করিবার জন্য ভ্রমণপথের এক-খানি মানচিত্র, কাশ্মীর ও তিব্বতের ইতিহাস, লামাদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি ও বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের বহু ছবি দেওয়া হইয়াছে এবং চীন, জাপান, কোরিয়া দেশে কোন সময়ে ও কাহা কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় সেই সমস্ত বিষয়ের ইতিহাস বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ৺অমর নাথ যাত্রীগণের পক্ষে এই পুস্তক একান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য—২৲

ভারত-অতীত ও বর্ত্তমান

বৈদিক যুগ হইতে ভারত কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান যুগে উপনীত হইয়াছে তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এই পুস্তকে পাইবেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতের প্রভাব, আবার ভারতের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ও হিন্দুধর্ম্মে নারীর স্থান ইত্যাদি মতবাদের গবেষণা পড়িয়া অনেকে শিক্ষালাভ করিবেন। মূল্য—১।০

ভালবাসা ও ভগবৎ-প্রেম

ভালবাসা, সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি মানবের যাবতীয় মধুরভাব ও সম্বন্ধের পশ্চাতে যে রহস্যময় সত্তা বিদ্যমান আছে তাহার সহিত ভগবৎপ্রেমের কি সম্বন্ধ স্বামীজী বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। মূল্য—।৵০

স্তোত্র রত্নাকর

এই পুস্তকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও শ্রীশ্রীসারদা দেবী সম্বন্ধে পদ্যে সুললিত বঙ্গানুবাদ সহ সাতটী সংস্কৃত স্তোত্র আছে। শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে রচিত "শ্রীশ্রীসারদা দেবা স্তোত্র" শুনিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী লেখককে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন "তোর মুখে সরস্বতী বসুক।" এই পুস্তকের পরিশিষ্টে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও জগন্মাতা সারদা দেবীর নিত্য পূজাবিধি এবং শ্রীশ্রীগুরুপূজা পদ্ধতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজী রচিত "শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম্" আরত্রিক ও প্রণাম মন্ত্র এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী অভেদানন্দজীর ছবি দেওয়া হইল। মূল্য—।৵০

যেমন শুনিয়াছি

(স্বামী অভেদানন্দজীর উপদেশ)

[প্রথম ভাগ]

ব্রহ্মচারী সম্বুদ্ধচৈতন্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত স্বামী অভেদানন্দজীর কতকগুলি অমূল্য উপদেশ। মূল্য—৸০

প্রাপ্তিস্থান—

ম্যানেজার

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা